মোহন-মালা।

(মায়া, লীলা, প্রায়শ্চিত্ত ও গণনা।)

নূতন সংস্করণ।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত,
মজিলপুর, ২৪ পরগণা।

মাঘ, ১৩০২।

মূল্য ।৹ আট আনা।

কলিকাতা,

২০ নং স্থকিয়া ষ্ট্রীট্, "কালিকা যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

পরম ভক্তি-ভাজন

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

মহাশয়কে,

তদীয় ভক্তের

এই ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

"মোহন-মালা"

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত

উপহার

প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

কাব্যামোদী সহৃদয় পাঠক যে, আমার "মায়া"কে এত স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, ইহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। "মায়া"র আকার অতি ক্ষুদ্র হওয়ায়, এই নূতন সংস্করণে, "মায়া"র সহিত আমার আর তিনটি গল্প সন্নিবেশিত করিয়া, গ্রন্থের নামকরণ করিলাম,—"মোহন-মালা"। অপিচ, এই "মোহন-মালা" অথবা "মায়া," "লীলা," "প্রায়শ্চিত্ত" ও "গণনা"য়, এবারও যদি আমি চিন্তাশীল পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারি, তবে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পরন্তু, শীঘ্রই এরূপ এবং অন্যরূপ "মালা" লইয়া আমি তাঁহাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইব, এমন ভরসাও রাখি।—আমার তহবিলে এমন "ছোট গল্প" অনেক মজুত আছে।

"মায়া"র সহিত তিনটি গল্প সংযুক্ত হইয়াছে;—সুতরাং গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির সহিত গ্রন্থের মূল্যও বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই নূতন সংস্করণে, স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি।

"মায়া"র প্রথম সংস্করণ পড়িয়া, বঙ্গের এক জন প্রধান সমালোচক ও দার্শনিক-পণ্ডিত আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, পরম শ্লাঘার সহিত তাহা এখানে প্রকাশ করিলাম।

"স্নেহাস্পদেষু।

তোমার "মায়া" বড়ই মনোহারিণী হইয়াছে।—মনুষ্যের মায়া নহে, ঈশ্বরের মায়ার অর্থ তুমি যেন যথার্থ বুঝিয়াছ, আর সেই ঈশ্বরের মায়া কিরূপে মনুষ্যের মায়ায় পরিণত হয়, তাহাও তুমি সুন্দররূপে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছ। আবার তোমার "মায়া"তে অপূর্ব্ব কবিত্ব দেখিলাম। ফলতঃ তত্ত্ব-কবিত্বের মিলনে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি বড়ই অপূর্ব্ব—বড়ই উচ্চদরের হইয়াছে। তোমার মঙ্গল হউক।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।"
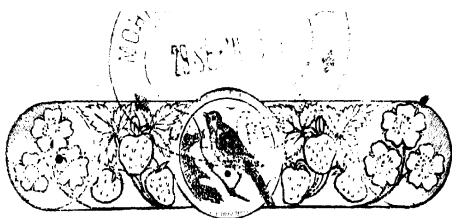
মোহন-মালা।

মায়া।

(১)

এক জনের সঙ্গে সঙ্গে জগতের আলোকরাশি নির্ব্বাপিত হইল! দূরে দূরে ছিলাম,—সংসারে আকৃষ্ট ছিলাম না, বাঁধিয়া রাখিবারও কেহ ছিল না,—আজ মনে হইতেছে, যেন সংসারে কেহ ছিল, যেন এ হৃদয়ের সহিত আর একটি হৃদয় বাঁধা ছিল,—সে চলিয়া গেল,—আমি মর্ম্মাহত হইলাম! উপরে চাহিলাম, অনন্ত নীলাকাশ,—মেঘশূন্য, নির্ম্মল; নিম্নে স্বচ্ছ-সলিলা গঙ্গা প্রবাহিতা! জনমানবের কোলাহল নাই, চারি-দিকে নীরবতা। এই নীরবতার মাঝে কি কোমল ও স্নিগ্ধ শান্তি বিরাজ করিতেছে! কেবল আমিই হায়!—এ কাতর হৃদয়ে, এ শান্তির মাঝে অশান্তি!

এক দিন,—আজীবন স্মরণীয় সে দিন,—এক দিন বুকের ভিতর এক দেবীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম! আজ সেই স্বর্ণপ্রতিমা, এই শ্মশানে রাখিয়া গেলাম! যেমনই নীরবে, নিভৃতে পূজা করিয়াছিলাম, তেমনই নীরবে, নিভৃতে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিলাম! কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না,—এই চিতাভস্মের ভিতর আমার বুকের হাড় রাখিয়া গেলাম!

চিতা জ্বলিল। সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি চিতার আগুনে ছাই হইতে লাগিল। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলাম। তেমন করিয়া চাহিয়া, হায়! আর কখন দেখিতে পাই নাই।

একে একে আকাশের তারাগুলি নিবিল,—আমার চোখের জলে চিতার আগুনও নিবিল! সকল আশা-ভরসা শ্মশানভরা ভস্মের মাঝে বিলুপ্ত হইল! ভাঙ্গা বুকে, গঙ্গাতটে, নির্জ্জন শ্মশানে বসিয়া রহিলাম। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, প্রভাত হইতে আর অল্পই বাকী। খুব শীতল বাতাস বহিতেছে। চিতা নিবিয়াছে;—এই উত্তপ্ত ভস্মের মাঝে, খুঁজিলেও কি, হায়! আর কিছুই মিলিবে না? চক্ষে আর জল নাই, বুকটা হুহু করিতেছে!

কি আশা ছিল, তা' জানি না,—এত দিন কিছুই বুঝি নাই! আজ মনে হইতেছে, হৃদয় অবলম্বনহারা হইল,—পৃথিবী একটা মহাশূন্য!

মনুষ্যজীবন কি একটা প্রহেলিকা? কেন এ মায়া? এক জনের উপর জীবনের এতখানি নির্ভর কেন?

দূরে কে গায়িল। প্রভাত সমীরণ ধীরে ধীরে গঙ্গাবক্ষে

লহরীগুলি জাগাইতেছে। নির্জ্জন শ্মশান। সে দূরাগত মধুর গীতধ্বনি বড় মধুর লাগিল।

গায়কের নিকট একটি বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বীণাযন্ত্র ছিল; তাহারই মধুর ঝঙ্কারের সহিত সে মধুর কণ্ঠ মধুরতর হইল। নির্ম্মল আকাশ, হাস্যময়ী প্রকৃতি,—কেবল আমার হৃদয়ের ভিতরেই মর্ম্মকাতরতা! সে কাতর হৃদয়ে, গায়কের সে বৈরাগ্য-গান মধুরতর হইতে মধুরতম অনুভূত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য শোক-তাপ ভুলিলাম; মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইলাম; দেশ-কাল-বর্ত্তমান ভুলিয়া, মুহূর্ত্তের জন্য, সে সঙ্গীত সুধায় ডুবিয়া রহিলাম।

গায়ক শ্মশানে আসিলেন। পরিধানে গৈরিক বসন, দেহ ভস্মাচ্ছাদিত, হস্তে বীণা। প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি, সুপ্রশস্ত ললাট, জ্যোতির্ম্ময় বিশাল নয়নযুগল, সুন্দর শ্রী। সমস্ত অবয়বে অনাসক্তির ভাব পরিব্যক্ত। নয়নে দিব্য জ্যোতি, অধরে মৃদু হাসি। মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সুন্দর সমাবেশ! সে পবিত্র, সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি দর্শনে, সে চরণপ্রান্তে মস্তক আপনিই অবনত হয়। আমি চিনিলাম। বড় দুঃসময়ে ভগবান দেখা দিলেন! ভক্তি-ভরে গুরুদেবের পবিত্রচরণে প্রণাম করিলাম। শান্তিহারা ব্যথিতপ্রাণ জুড়াইল।

তিনি তখনও গায়িতেছেন। গান, দেবভাষায় গীত হইতেছে। তাহার মর্ম্ম এইঃ—

"সুন্দর প্রভাত, সুন্দর সময়!—চক্ষু মেলিয়া যাহা দেখিতেছি, সকলই সুন্দর! মানুষ কেন অসুন্দর থাকিবে? প্রফুল্ল হৃদয়ে সবাই গায়িতেছে,—মানুষ কেন নিরানন্দ প্রাণে অবস্থান করিবে? পবিত্র হৃদয়ে, পবিত্রতর হইতে পবিত্রতম যে ভগবান,

কেন না, তাঁহাকে স্মরণ করি? সংসারের এই তুচ্ছ সুখ, এই মিথ্যা-জীবন—এই জীবনের এই ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ,—মানুষের কি ইহাই চরম লক্ষ্য? ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ ভাঙ্গিয়া যাক, মোহ অপসারিত হোক, সঙ্কীর্ণতা দূর হোক! মানুষ জাগ্রত হও, পবিত্র হও, নবজীবন লাভ কর!"

ধীরে, অতি ধীরে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে উচ্চে, আরও উচ্চে, আরও উচ্চে সে মধুর কণ্ঠ উঠিল। সে সময়ে, সে দেবসঙ্গীত যাহারা শুনিল, তাহারা ধন্য হইল; সে সঙ্গীতে যাহারা জাগিল, তাহারা আরও ধন্য হইল! যথাসময়ে গান থামিল; আমি আবার ভক্তিভরে, সাষ্টাঙ্গে গুরুদেবকে প্রণাম করিলাম।

তিনি সস্নেহে বলিলেন, "বৎস! এখনও এখানে কেন?"

কিছুই বলিলাম না,—বলিতে পারিলামই না। কিন্তু কিছুক্ষণের পর, বুকটা আবার হুহু করিয়া উঠিল, হৃদয় ফাটিয়া অশ্রুরূপে শোণিতধারা নির্গত হইল। পতিতপাবন হাত ধরিয়া কহিলেন, "বৎস! এইবার তুমি জীবন পাইবে!"

সাশ্রুনয়নে, নির্ব্বাপিত চিতাভস্মপানে তাকাইয়া কহিলাম, "প্রভু, আমার জীবন? সে ত এইখানেই পুড়িয়া ছাই হইয়াছে!"

অন্তর্য্যামী হাসিলেন। বলিলেন, আসক্তি ও মায়া এইখানে পুড়িয়া ছাই হইয়াছে! এখন আইস,—এইবার তুমি নবজীবন লাভ করিবে!"

গুরুদেব অগ্রবর্ত্তী হইলেন, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। চলিতে চলিতে একবার জন্মের মত সে পবিত্র স্থান দর্শন করিলাম, জন্মের মত সে স্থানে আর একবার অশ্রু ত্যাগ করিলাম। জীবনে, সে স্থানে, আর একবার মাত্র আসিয়াছিলাম।

যাইতে যাইতে আর একবার দাঁড়াইলাম। শ্মশানের পানে চাহিয়া, মনে মনে এই কবিতাটি আবৃত্তি করিলাম ;—

"প্রশান্ত গম্ভীর স্থির বিজন শ্মশান!
অনন্ত কালের সাক্ষী পবিত্র মহান্!
প্রেম-শিক্ষাদাতা, বন্ধু, মুক্তির সোপান!
তুমি সত্য, নিত্য, ধ্রুব, বিজয়-নিশান!
পাপদর্প-খর্ব্বকারী সত্যের বিকাশ,
তোমার মাহাত্ম্যে হয় ধর্ম্মের প্রকাশ!
পরিণাম—তুমি স্থান, মহা-সম্মিলন!
চিতা-ভস্ম স্মৃতি রাখ হরিনাম গান!
চির শান্তি সাম্য-নীতি ভুবনবিদিত,
'অনিত্য-সংসার'-শিক্ষা তোমাতে নিহিত!
আদিগুরু, মহাগুরু, নমি তব পায়।
হে শ্মশান, কর ত্রাণ, বন্ধন-কারায়!! *"

শরীর রোমাঞ্চিত হইল ; অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া গেল। ক্ষণপরে প্রকৃতিস্থ হইয়া, ত্বরিতপদে, গুরুদেবের অনুসরণ করিলাম।

---

(২)

বিন্ধ্যাচলের পদপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কানন। কাননাভ্যন্তরে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। সেই কুটীরে গুরুদেব আমাকে শিক্ষা দিতেন। পুরাণ, উপনিষদ, দর্শন প্রভৃতি, গুরুদেবের কৃপায়, কিছু কিছু আমার আয়ত্ত হইতে লাগিল। সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে লাগিলাম। গুরুদেব বুঝাইয়া দিয়াছেন, আত্মজ্ঞানের

---

* মদ্বিরচিত "ফুল" নামক কবিতা-পুস্তক হইতে এই কবিতাটি গৃহীত।

উপরই ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত;—আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করিতে লাগিলাম।

অলসভাবে এক মুহূর্ত্তও অতিবাহিত না হয়, এজন্য নিয়তই তিনি কোন-না-কোন কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত রাখিতেন। এত করিয়াও তবু অতীতের কেবল একটি স্মৃতি ভুলিতে পারিলাম না। একখানি ক্ষুদ্র মুখ—লাবণ্য, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার আধার একখানি ক্ষুদ্র মুখ, এই আঁখি দু'টার মাঝে নিয়তই জাগিত! প্রাতেঃ পুষ্পচয়ন করিয়া, ইষ্টদেবতাকে পূজা করিতে বসিতাম,—ইষ্টদেবতা এ হৃদয়ে আসন না পাইয়া, সেই প্রেমময়ী মূর্ত্তি, হৃদয়ের সমস্ত স্থানটা যুড়িয়া লইত! অঞ্জলিবদ্ধ কুসুমরাশি অশ্রুসিক্ত হইয়া, বালার কোমল চরণে উৎসর্গীকৃত হইত! সন্ধ্যাকাশ-তলে গঙ্গাতটে বসিয়া, সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতাম,—মনঃসংযোগ হইত না,—গঙ্গালহরার সহিত নয়নাশ্রু মিশাইতাম! দুর্ব্বলতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

গুরুদেবের উপদেশ কি সকলই ব্যর্থ হইল? বুঝিতাম না যে, তাহা নহে। বুঝিয়াও কিন্তু প্রাণে বল পাইতাম না। মায়ার খেলা বলিয়া সকলই অনুভব করিতাম। কিন্তু মায়া অতিক্রম করিতে পারিতাম কৈ? দুঃখ এই, সাধ করিয়াও যে, মায়া কাটাইতে চাহিতাম না! এই মায়ার রাজত্বে যদি অনন্ত যন্ত্রণাও থাকে, বুক পাতিয়া তাহা লইতে সাধ যায়! কেন এমন হয়? সেই ক্ষুদ্র বাহু দু'খানির মধ্যে জন্ম জন্ম বন্দী থাকিতে পাইলেও কৃতার্থ হই! কেন? একি দুর্ব্বলতা? এত বুঝিলাম, এত শিখিলাম, কি হইল? জীবনে এত দুর্ব্বলতা কেন আসিল? জীবনের উচ্চ আদর্শ চক্ষের সম্মুখে,—হায়, কেন তাহা হেলায় হারাই-

তেছি! আপনার সহিত সংগ্রাম করিয়া আপনিই ক্ষতবিক্ষত হইতেছি;—হায়, ভুলিতে কি পারিব না? ধন্য সে মহাত্মা, বিস্মৃতি যাঁর আয়ত্তাধীন;—কোটী কোটী প্রণাম তাঁর শ্রীচরণে,—জীবনসর্ব্বস্ব প্রিয়জনের স্মৃতি, যিনি অন্তর হইতে এককালে অন্তর্হিত করিতে পারেন!

গুরুদেব সব বুঝিলেন। কত সারগর্ভ, অমূল্য উপদেশ দিলেন; কিন্তু সকলই বৃথা হইল। একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রভু, সব বুঝিতেছি, তবু দুর্ব্বলতা ঘুচিতেছে না কেন?"

তিনি বলিলেন, "তোমার পূর্ব্বজন্মের সংস্কার!

ব্যথিত-হৃদয়ে কহিলাম, "এ যন্ত্রণার কি, তবে অবসান নাই?—ভুলিতে কি পারিব না?"

তিনি ঈষৎ হাসিলেন। সে হাসিতে যেন প্রকৃতির একটি গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। তিনি গম্ভীরভাবে আমাকে বলিলেন, "ভুলিতে পারিবে না? কেন পারিবে না? এই নীলিমাময় অনন্ত আকাশ, এই উদার পৃথিবীতল, এই অসংখ্য জীব-জন্তুপরিপূরিত প্রাণি-জগৎ-এই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, পর্ব্বত, সমুদ্র ও বিবিধ বৃক্ষরাজি-পূর্ণ শ্যামলা মেদিনী,—কেন, ইহাপেক্ষা সুন্দর কি, সেই বালিকার মুখখানি? এই জগতের অভ্যন্তরে যে মহাপ্রাণ,—তাহার কাছে কি বালিকার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু? যে মহাশক্তিকে অবলম্বন করিয়া কোটী কোটী সৌরজগৎ—কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, তাঁহার জ্ঞান—তাঁহার ধ্যান অপেক্ষা কি, সেই বালিকার মুখমণ্ডল চিন্তা করা অধিক সুখের? এই অনন্ত

সৌন্দর্য্য—অনন্ত জ্ঞানের নিকট কি, সেই বালিকার ক্ষুদ্র রূপ? কেন,—মানুষ কি সামান্য? সাধনার বলে, এই ক্ষুদ্র মানুষ কত মহৎ হয়! সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহাপ্রাণে, মানুষ আপনার ক্ষুদ্র প্রাণ নিমগ্ন করিতে পারে! তন্ময়চিত্ত হইয়া, আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞান বিস্মৃত হইতে পারে! একি সামান্য ব্যাপার? যদি সেই মহাসিন্ধুতে এ ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু বিসর্জ্জন করিতে পার, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা আর কি সুখ আছে? এ সুখের বিনিময়ে, পার্থিব কোন্ পদার্থ, কি দিতে পারে? সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিনিময় করিলেও কি, এ সুখের পূর্ণতা হয়? বৎস! অধীর হইও না,—আত্মহারা হইয়া নিজ শিব চরণে দলন করিও না! সংযমী হও,—সংযম-ব্রত শিক্ষা কর! আত্মসংযম যোগীর লক্ষণ। মানুষমাত্রেরই অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও যোগীর ভাব থাকা কর্ত্তব্য। তুমি বুদ্ধিমান,—সাধনা কর, অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিবে।"

পতিতপাবনের আশ্বাস বাক্যে, আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। দরবিগলিতধারে আনন্দাশ্রু পড়িয়া, আমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। কৃতজ্ঞতায়, মস্তক আপনা হইতেই সেই মহাপুরুষের চরণে লুণ্ঠিত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুদেবের পাদপদ্ম ধরিয়া কহিলাম, "দয়াময়! যখন এতদুর দয়া করিয়াছেন, তখন আর এ অধমকে বঞ্চিত করেন কেন? প্রভু, স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিন, কিরূপে আমি এ মায়া ও আসক্তির হাত এড়াইব?"

অন্তর্যামী, আমার অন্তর বুঝিলেন। প্রথমে একটু হাসিলেন, পরক্ষণেই ধীরগম্ভীরভাবে কহিলেন, "বৎস! অধৈর্য্য হইও না; তোমার শুভ প্রারব্ধ দেখা দিয়াছে। মায়া ও আসক্তি

সকল অনর্থের মূল বটে, কিন্তু এই মায়া ও আসক্তি হইতেই, আবার সময়ে, সুফল লাভ হয়। সংসারের সকল বস্তুতেই এই নিয়ম খাটে। দেখ, যে হলাহল সেবনে মানুষের আশু-মৃত্যু ঘটে, অবস্থা বিশেষে, সেই হলাহলই আবার মানুষের সঞ্জীবনী শক্তি হয়। তোমার এই আসক্তি ও মায়াও তোমাকে সেই-রূপ সুফল প্রদান করিবে। তাই বলি, বৎস! হতাশ হইও না। প্রাণপণে সাধনা কর। সাধিলে, অবশ্যই সিদ্ধ হইবে!"

কিন্তু এ কথায়ও আমি নিঃসংশয়চিত্ত হইতে পারিলাম না। অন্তর্যামী তাহা বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, আমাকে অটল বিশ্বাসে বলীয়ান্ করিতে না পারিলে, আমার আর পরিত্রাণ নাই। দয়াময় দয়া করিলেন। স্নেহমাখাস্বরে, আমার অঙ্গে পদ্মহস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে কহিলেন, "প্রবোধ, তুই ধন্য! তোর পিতামাতাও ধন্য! আর ধন্য আমি যে,—

বলিতে বলিতে গুরুদেবের সেই বিশাল চক্ষু আরও বিস্ফা-রিত হইল; সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া আবার কহিলেন, "আর ধন্য আমি যে, বৎস! তোমার মত শিষ্যরত্ন লাভ করিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, এই 'মায়া'-প্রভাবেই, অচিরাৎ তুমি, সর্ব্বভূতেই সেই মহামায়ার প্রতিকৃতি দেখিতে পাইবে! বৎস! তোমার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতী আছে;—সাধনা কর, অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিবে!"

আমি পরম পুলকিত হৃদয়ে, ভক্তিভরে গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। কৃতজ্ঞতায় আমার আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

গুরুদেব পুনরপি কহিলেন, "যাও বৎস, গৃহে যাও,—

জননী-জন্মভূমি দর্শন কর। এইবার তোমার পরীক্ষা হইবে। ঠিক আর এক বৎসর পরে, ঐ শ্মশানে,—যেখানে তোমার নব-জীবনলাভের সূত্রপাত হইয়াছে,—সেই মহাস্থানে আমার দর্শন পাইবে। সেইখানে তোমার আমার মহামিলন হইবে!"

এই বলিয়া, পতিতপাবন ভগবান বীণায় ঝঙ্কার দিলেন। সেই মধুর ঝঙ্কারে কণ্ঠ মিলাইয়া জয়দেবের সুধার-সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন ;—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং।
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে॥

গান গায়িতে গায়িতে গুরুদেব ভাবে তন্ময় হইলেন। আহা, সে মূর্ত্তি কি সুন্দর! মনে হইলে এখনও আমার হৃদয়ে প্রেমের প্রস্রবণ বহিতে থাকে। গুরুদেব গায়িতে লাগিলেন ;—

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধারণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর, জয় জগদীশ হরে॥

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ, জয় জগদীশ হরে॥

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গং।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ, জয় জগদীশ হরে॥

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপং।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ং।
কেশব ধৃতরামশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং।
কেশব ধৃতহলধররূপ, জয় জগদীশ হরে।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
কেশব ধৃতকল্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥"

গান থামিল। সে স্বর দিক্‌দিগন্তে ধ্বনিত হইল,—"জগদীশ হরে!" স্রোতস্বতী কুলু কুলু স্বরে গায়িল,—"জগদীশ হরে!" অরণ্যের পশু পক্ষী, জীবজন্তু সে গানে চমকিত হইল; মুগ্ধমনে গায়িল,—"জগদীশ হরে!" বিন্ধ্যাচল কাঁপিয়া উঠিল; গম্ভীরনাদে গায়িল,—"জগদীশ হরে!" অনন্ত প্রকৃতিও যেন একতানে গায়িতে লাগিল,—

"জগদীশ হরে!"

স্বর্গে-মর্ত্তে তখন আর বুঝি কোন ব্যবধান নাই!

আমি আর তখন আমাতে নাই। আমিত্ব হারাইয়া, তখন আমি যেন এই সঙ্গীত-সুধায় ডুবিয়া গেলাম; পরমানন্দ ভোগ

করিতে লাগিলাম। সে আনন্দ, কেবল অনুভবনীয়, বুঝাইবার নহে।

যথা সময়ে, গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিয়া, তাঁহারই আদেশমত, স্বদেশ-যাত্রা করিলাম।

(৩)

এ অবধি আমার বিশেষ কোন পরিচয়, আমি দিই নাই। পরিচয় দিবারও বিশেষ-কিছু নাই। আমার এ দুঃখময় জীবন-কাহিনী কে শুনিবে? উপন্যাসের কথা কিছুই নাই;—ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র-কাহিনী;—তোমাদের ভাল লাগিবে কি?

ভাগলপুর জেলার কোন একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে আমার বাস। জাতিতে ব্রাহ্মণ;—আমার পূরা নাম,—প্রবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। হতভাগ্য আমি,—অতি শৈশবেই পিতা মাতাকে হারাইয়াছি। প্রাণ ভরিয়া পিতা-মাতার নাম উচ্চারণ করিতে পারি নাই।

সংসারে এক বিধবা পিসি ছিলেন,—তাঁহারই যত্নে লালিত-পালিত হইতে লাগিলাম। আমার পিতার অবস্থাও ভাল ছিল না,—কোন রকমে কষ্টে-সৃষ্টে পিসি আমাকে মানুষ করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে আমি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলাম। আমার স্মরণশক্তি ও বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল। আমার স্বভাবও অতি বিনীত ছিল। এজন্য আমি শিক্ষকগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলাম। বিশেষ দুঃখীর ছেলে বলিয়া, সকলেই আমাকে দয়া করিতেন।

পথের পথিক অবধি আমাকে দয়া করে দেখিয়া, আমার স্বাভাবিক কোমল অন্তর, আরও কোমল—করুণাময় হইয়া উঠিল। জগতে দয়ার এত আধিক্য দেখিয়া, আমার চক্ষে জল আসিত। কি উপায়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়, জানিতাম না; তাই বিরলে বসিয়া শতধারে, আপন মনে বুক ভাসাইতাম।

তোমরা আমাকে আত্মম্ভরী বা কপট ভাবিও না। নিজের মুখে নিজের প্রশংসাবাদ করিতেছি দেখিয়া, আত্মবঞ্চক ও লঘু-চেতাবোধে আমায় ঘৃণা করিও না। প্রকৃত কথা যাহা,—অন্ততঃ আমি যাহা বুঝিয়াছি, অবিকল তাহাই বলিয়া যাইতেছি,—প্রবৃত্তি হয় ত শুনিয়া যাও।

অল্পদিনের মধ্যে আমি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলাম। কোম্পানী হইতে "জল-পানি"ও পাইলাম। পিসীমার-আমার আনন্দের আর অবধি নাই,—তিনি আমার পিতামাতাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে আমি ইংরেজী ইস্কুলে নিযুক্ত হইলাম। পাঁচ বৎসরের মধ্যে, প্রবেশিকার পাঠও সাঙ্গ করিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে, এ পরীক্ষায়ও প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলাম।

দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই সময়ে আমার পিতৃস্বসা ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। সংসার অন্ধকার দেখিলাম। সংসারে 'আহা' বলিতে আমার আর কেহ রহিল না। যাহাদের মুখ চাহিয়া মানুষ সংসারে মরে, বাঁচে; যাহাদের মায়ায় মানুষ আত্ম-বিস্মৃত হয়; আমার সে বন্ধন আর কিছুই রহিল না। এই সময়ে আমার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র।

---

(৪)

এই অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের মধ্যে, আমার জীবনের এক বিপর্য্যয় ঘটিল। এইবার সেই কথা বলিব।

আমাদের বাটীর পার্শ্বেই একঘর মধ্যবিৎ গৃহস্থ বাস করিতেন। জাতিতে ব্রাহ্মণ, নাম—উমাকান্ত মুখোপাধ্যায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি কন্যা ছিল, নাম—মায়া দেবী। মায়া দেখিতে বড় সুন্দর। চাঁদপানা মুখ, সুকুমার অঙ্গসৌষ্ঠব, সুকুঞ্চিত কেশরাশি,—সুরূপা, সুলক্ষণা। মায়া আমা অপেক্ষা তিন বৎসরের ছোট। শৈশবে আমরা একত্র খেলা করিতাম, একসঙ্গে বেড়াইতাম, উভয়ে মনের কথা মন খুলিয়া কহিতাম। আমরা উভয়ে উভয়কে ভাল বাসিতাম। মায়ার জনক-জননীও আমাকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন।

শৈশবের সেই খেলা-ধূলার সহিত আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালবাসা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু যখন আমরা উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত হইলাম, তখন আমাদের উভয়েরই দেখা-শুনা একরূপ বন্ধ হইল।

মায়ার পিতা কুলীন-কুল-চূড়ামণি। তাঁহার পাল্‌টি-ঘর বড়ই দুষ্প্রাপ্য। অনেক স্থলে পাত্রের অনুসন্ধান হইতে লাগিল; কিন্তু পাত্র মিলিল না। দেখিতে দেখিতে মায়া যৌবনসীমায় পদার্পণ করিল।

বাপ-মায়ের আহার-নিদ্রা উঠিল। শেষে অনন্যোপায় হইয়া তাঁহারা আমাকেই কন্যাদান করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

পিতৃস্বসার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই, একদিন মায়ার পিতা আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, "প্রবোধ, তোমাকে আমার একটি

কথা রাখিতে হইবে। বাবা, তোমাকে সন্তানের ন্যায় দেখি, —তাই তোমার উপর এতটা আধিপত্য করি।”

আমি বিনীতভাবে কহিলাম, “কি বলিবেন, বলুন ; আমার সাধ্যাধীন হইলে, প্রাণ দিয়াও তাঁহা সমাধা করিব।

মায়ার মাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কাঁদ-কাঁদ মুখে আমাকে কহিলেন, “বাবা, উনি আর বলিবেন কি,—আমিই বলিতেছি,—মায়াকে তুমিই বিবাহ কর! মেয়ের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া, আমাদের আহার-নিদ্রা উঠিয়াছে। আর ত মায়াকে আইবুড় রাখিতে পারি না, বাবা!”

মায়ার পিতা কহিলেন, “বাবা, ভাবিতেছ কি? ব্রাহ্মণের জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা কর। বিপন্নকে দয়া করিলে, সেই বিপদ-ভঞ্জনও তোমাকে দয়া করিবেন।”

আমি তথাপি কোন উত্তর করিলাম না,—উত্তর করিতে পারিলামই না। অতীতের অনেক দিনের অনেক কথা, একে একে আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। “বি-বা-হ”! অতি ধীরে ধীরে, এই প্রশ্ন মনে জাগিল।—“কেন?—ইচ্ছা করিয়া এ মায়া ফাঁসি গলায় দিই কেন? সংসারে থাকিয়া, সংসারী হইয়া, কে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারে? অর্থে ও মনুষ্যত্বে ত আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অথচ, সংসারী হইতে হইলে, অর্থের বিশেষ আবশ্যক। তবে কেন ইচ্ছা করিয়া, সেই পরমার্থলাভে বঞ্চিত হই?”

মনে মনে এই প্রশ্ন জাগিল। আর সেই জন্যই নিশ্বাসটা কিছু জোরে পড়িল।

মায়ার পিতা আমার মনের ভাব বুঝিলেন। তিনি বাল্য-

কাল হইতেই আমাকে জানিতেন; আমার প্রকৃতি বিশেষরূপ বুঝিতেন। তিনি কিছু বিষণ্ণভাবে কহিলেন, "তবে কি বাবা, আমি ধর্ম্মচ্যুত—জাতিচ্যুত হইব? বিপন্ন ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করায় কি ধর্ম্ম নাই?"

এবার আর আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। একটু চক্ষুলজ্জা হইল। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও একটু দ্রব হইল। বিনীত ভাবে, মায়ার পিতাকে কহিলাম, "আপনি আমার পিতার তুল্য; আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য! কিন্তু—"

মায়ার পিতা কহিলেন, "কিন্তু কি? বাবা, তোমার হাতে ধরি, এ বিষয়ে আর অমত করিও না। আগামী শুভ দিনে, তোমাকে এ শুভকর্ম্ম করিতেই হইবে।"

আমি আর কোন কথা কহিতে পারিলাম না। আমার মৌনে, সম্মতির লক্ষণ প্রকাশ পাইল। কিছুক্ষণ পরে কেবল এই কথাটি কহিলাম, "আমাকে কন্যাদান করিলে ত, আপনাকে 'পতিত' হইতে হইবে! সমাজে ত, আপনার সম্ভ্রমের লাঘব হইবে!"

মায়ার পিতা কিছু ক্ষুণ্ণভাবে কহিলেন, "বাবা, তা জানি। কিন্তু কি করি, আর উপায় নাই।"

মায়ার মা কহিলেন, "সমাজ এমনেই বা উঁহাকে কি 'ছাতা দিয়া মাথা' রাখিয়াছে! এই ত, মেয়ে পনরয় পা দিয়াছে, কে সে জন্য একবার 'আহা' বলে! বাবা, আমরা বোকা মেয়ে-মানুষের জাত,—'কুলীন' 'বংশজ' অত-শত বুঝি না। বুঝি এই যে, মেয়ে যাতে সুপাত্রস্থ হয়, বাপ মায়ের আগে তাই দেখা দরকার। বাবা, তোমাকে আমি পেটের ছেলের মত দেখি;—

তোমার মত সুপাত্রের হাতে মায়াকে সঁপে দিতে পারিলে, আমি আপনাকে সার্থক জ্ঞান করি।"

আর কথা-কাটাকাটি করা বৃথা বুঝিয়া, আমি মায়ার পিতার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। হায়, সেইদিন হইতেই আমার জীবনে এক নূতন তরঙ্গ উঠিল!

আমি, বিবাহ করিতে সম্মত হইলে, মায়ার পিতা মাতার আর আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহারা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে আমাকে কত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মায়ার মা আবেগভরে কহিলেন, "বাবা, তোমার শত বর্ষ পরমায়ু হোক। আজ তুমি যে কাজ করিলে, নারায়ণ অবশ্যই তোমার মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। আশীর্ব্বাদ করি, আমার মায়াকে নিয়ে তুমি ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ কর!"

আমি মাথাটি হেঁট করিয়া সকল কথা শুনিলাম।

অতঃপর শুভদিনে, শুভলগ্নে, আমাদের শুভ উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।

---

(৫)

বিবাহের পর, আমি কলেজের পাঠ অধ্যয়ন করিতে এলাহাবাদে গমন করিলাম। সেখানে আমার দূরসম্পর্কীয় এক মাতুল বাস করিতেন। তিনি সেখানকার একজন প্রসিদ্ধ উকীল। আমার লেখা পড়ার খরচ পত্রের তিনি অনেক সাহায্য করিতেন। শ্বশুর মহাশয়ও সময়ে সময়ে কিছু কিছু দিতেন। আমি সেখানে 'এফ'-এ পড়িতে লাগিলাম। মায়া, পিত্রালয়েই রহিল।

বাল্যকাল হইতেই আমি কিছু নির্জ্জনপ্রিয়। সুকুমার সাহিত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতে আমি ভাল বাসিতাম। অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া, প্রাচীন কাব্য ও হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের কিছু কিছু অধ্যয়ন করিতাম। আমার পিতা পরম বৈষ্ণব ছিলেন। আমাদের কুলধর্ম্মও বিষ্ণু-উপাসনা। বৈষ্ণব-পিতার পুত্র বলিয়াই হউক, আর পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি-বশতই হউক,—স্বধর্ম্মে অনুরাগ, ঈশ্বরে ভক্তি, দেবদ্বিজে শ্রদ্ধা, শাস্ত্র ও সাধুবাক্যে বিশ্বাস, বাল্যকাল হইতেই আমার হাড়ে হাড়ে—মজ্জায় মজ্জায় মিশ্রিত হইয়াছিল। মাতৃস্তন-দুগ্ধ পানের সহিত ভক্তির আস্বাদ পাইয়াছিলাম। তাহার উপর আজীবন শোক তাপ ও দারিদ্র্যদুঃখ আমার হৃদয়ের অলঙ্কার হইয়াছিল। এইরূপ নানা কারণে শৈশবেই আমার মন উদাস হইয়া যায়। গৃহে আমার মন বসিত না। সাংসারিক প্রলোভন আমাকে আকৃষ্ট করিতে পারিত না। মনে হইত,—"কেন এ জীবন? কোথা হইতে আসিয়াছি? যাইবই বা কোথায়? জীবনের কার্য্যই বা কি?" এ চিন্তায় অনেক চিন্তা মনে জাগিত। অনেক সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের আলোচনা করিতে সাধ যাইত। আবার অনেক সামান্য বিষয়,—যাহা সংসারের সামান্য লোকেও জানে, তাহা লইয়া বিস্তর মাথা ঘামাইতাম; কিন্তু কোন মীমাংসা করিতে পারিতাম না। আপন মনে কখন হাসিতাম, কখন কাঁদিতাম, কখন বা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতাম। আমার সদাই এই মনে হইত,—"সংসারে যে এত মানুষ রহিয়াছে,—সকলেই দেখিতে পাই, আপন আপন অতি তুচ্ছ কাজ লইয়াই ব্যস্ত। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া, এটা সেটা

সাংসারিক কার্য্য সাধন ও আহারান্বেষণ, অথবা বিলাসবিভ্রম-বিহার করে, না হয় নির্দ্দিষ্ট কোন একটা তুচ্ছ কাজে লিপ্ত হয়। তাহাও আবার সেই একটানা, একঘেয়ে সুরে ধরা-বাঁধা। রাত্রেও আবার ঐ নিয়মে ছোট ছোট কটা ধরাবাঁধা কাজ। ঠিক যেন কলের পুতুলটির মত। এইরূপ—আহার, বিহার, নিদ্রা, অর্থোপার্জ্জন, আর বংশবৃদ্ধি—এই লইয়াই ত দেখিতেছি, পনর আনা মনুষ্য-জীবন! যেন আর কোন কাজ নাই! জীবনের কোন লক্ষ্য নাই! মরিতে আর হইবে না!—যম যেন ভুলিয়া আছে! এই ভাবেই সংসারটা চলিতেছে। তাহাও নয় বুঝি যে, কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি আছে,—কাজের এই ধরাবাঁধা নিয়মের পরিবর্ত্তে, কোনরূপ নূতনত্ব আছে;—তাহা হইলেও না হয়, মনকে প্রবোধ দিতাম। এই স্থিতিস্থাপকহীন, একটানা, একঘেয়ে, ভারবহ জীবনে আমার মন বসিত না। আমি সদাই একটা মহা অভাব অনুভব করিতাম। বাস্তবিক, জীবন আমার একটা মহাশূন্য বোধ হইত। ভাবিতাম, কেন, মানুষের কি কোন স্বাধীনতা নাই?"

রোগ বুঝিয়া নিজের ঔষধ নিজেই ব্যবস্থা করিলাম। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে আমার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। একটু একটু কবিতাও লিখিতে পারিতাম। বিদ্যালয়ের পাঠ অল্প সময়েই সাঙ্গ করিয়া, আমি অনেক সময় কবিতা ও গানে মগ্ন থাকিতাম। প্রাচীন কাব্য সকল পাঠ করিতাম, কখন বা মনের ভাব একত্রিত করিয়া ছোট ছোট কবিতা লিখিতাম। এক লেখা শতবার পড়িতাম। তাহাতে মনে বড় আনন্দ হইত। গুন্ গুন্ স্বরে আপন মনে স্বরচিত গান ও অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্মবিষয়ক গান গায়িয়া, অনেকটা শান্তি পাইতাম।

মনের এই দারুণ দুরবস্থার সময়, মনে মনে বার বার এই কবিতাটি আবৃত্তি করিতাম ;—

"বিষম জীবন-ভার সহে না—সহে না আর
একি হায়, দারুণ বন্ধন।
মর্ম্ম-গ্রন্থি ছিঁড়ে গেল হৃদি পুড়ে খাক্ হ'ল
এ সময় কোথা নারায়ণ।

দেখা দাও—দেখা দাও শ্রীমুখে হে কথা কও
দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ-রূপে হরি।
প্রাণ খুলে কই কথা জুড়াই মরম-ব্যথা
'রাবণের চিতা' দূর করি'!

মুখ-পানে চাই যার অন্ধকার—অন্ধকার
ঘোর হ'তে ঘোরতম হেরি ;
লক্ষ্যভ্রষ্ট দিশেহারা যেন রে পাগলপারা
সে বিষাদে আপনা পাসরি।

'সামাল সামাল' সবে কার মুখ কেবা চাবে
'এক ভস্ম আর ছাই' হায়।
মিটেছে সংসার-সাধ টুটেছে বালির বাঁধ
সমাধি-জীবন লও পায়!

অন্তর্যামী তুমি হরি, পরীক্ষা না দিতে পারি,
নিজগুণে হে কাণ্ডারি, তার!
গোপিনী-বল্লভ শ্যাম হ'ওনা—হ'ওনা বাম,
দীননাথ, দীনে দয়া কর!

অগতির তুমি গতি কূল দাও হে শ্রীপতি,
পলে পলে আত্মহত্যা হ'তে ;
ইহ পর উভলোক যদি যায় দুই লোক
কেন তবে পাঠালে জগতে?

কেন এ মানব-জন্ম কোটী-কল্প যুগধর্ম্ম—
কর্ম্মক্ষেত্রে অধমে পাঠালে ;
কেন হৃদে প্রেম-প্রীতি কণাংশে এ ভক্তি-স্মৃতি
প্রাণনাশা ভালবাসা দিলে ?

* * *

সংযম বিহনে হরি, ভেসে যায় মন-তরী,
ভয়-বাধা কিছু নাহি মানে ;
একি মোহ, একি তৃষা, প্রাণঘাতী কি দুরাশা,
হৃষীকেশ, রাখ এ তুফানে !
না চাহি প্রেমের হাসি, প্রিয়জন প্রেমভাষী,
স্বর্গভ্রষ্ট চাঁদ-মুখ আর !
বন্ধন ঘুচায়ে হরি, লও মোরে কৃপা করি',—
জীবন-সর্ব্বস্ব উপহার !!" *

কবিতা পাঠে দরবিগলিত ধারে আমার চক্ষে জল পড়িত। হায়, দেবতার চরণেও কি, আমার এ মর্ম্মকাতরতা স্থান পাইল না ?

---

(৬)

কিন্তু, ভবিতব্য কে খণ্ডন করিবে ? যাহা হইবার, তাহা হইল। পিসীমার পরলোক গমনের অব্যবহিত পরেই আমি বিবাহিত হইলাম। বিবাহের পর এলাহাবাদে কলেজের পাঠ অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। কিন্তু এইখানে আসিয়া, আমার জীবনের আর এক বিপর্য্যয় ঘটিল। ক্রমেই তাহা বর্ণন করিতেছি।

---

* "ফুল" হইতে গৃহীত।

একদিন সন্ধ্যার সময়, যমুনার তীরে, এক শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত সোপানোপরি বসিয়া আমি সংসারের নশ্বরতা বিষয়ে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দূরে কে গায়িল,—

"মায়া-সূতোয় জাল বুনেছে সৃষ্টিধর-জেলে।"

আমার চমক ভাঙ্গিল। হৃদ্‌তন্ত্রীতে কে যেন আঘাত করিল। দেশ কাল সকলই ভুলিয়া, সে সঙ্গীত-সুধায় ডুবিয়া গেলাম। সে সুধাময় স্বর ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি একাগ্রচিত্তে সে সুধা পান করিয়া ধন্য হইলাম। গায়ক গায়িতে লাগিলেন,—

"মায়া-সূতোয় জাল বুনেছে সৃষ্টিধর-জেলে।
জালের 'সূৎ' ধ'রে দাঁড়ায়ে আছে, (সেই) রবির ছেলে॥
সৃষ্টিধর সে জেলে বেটা, ধ'রে আছে জালের বোঁটা,
ভাল লাগিয়েছে নেটা,—
বড় ফেলেছে কলে;—
(কেবল) পালিয়ে গেছে রূপ সনাতন,
সেই জালের গেরো খুলে॥"

গায়ক আমার সম্মুখীন হইলেন। পরিধানে গৈরিক বসন, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, হস্তে বীণা। প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি, জ্যোতির্ম্ময় বিশাল চক্ষু, অধরে মৃদু হাসি। আমার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মস্তক আপনা হইতেই সে মহাপুরুষের চরণে প্রণত হইল। তিনি তখনও গায়িতেছেন,—

"করি মায়া, মহামায়া,
(জাল) প্রসব করেন ভব-জায়া,
বিস্তারি' মায়া;—

(জাল) রয়েছে ব্রহ্মাণ্ড যুড়ি'
এই ভব-নদীর জলে॥"

অতি কোমলে আরম্ভ করিয়া, সে স্বর কড়ি-মধ্যমে উঠিল। দিক্‌দিগন্ত তাহাতে প্রতিধ্বনিত হইল। যমুনার কাল জল উছলিয়া উছলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। উপরে চাহিলাম,—দেখিলাম, আকাশের চাঁদের হাসি ম্লান হইয়াছে। নক্ষত্রপুঞ্জও বুঝি নিষ্প্রভ হইয়াছে। পরম সৌন্দর্য্যাধার সে পবিত্র মূর্ত্তির আবির্ভাবে, নৈশপ্রকৃতির সে অনুপম সৌন্দর্য্যও আমার চক্ষে ম্লান বোধ হইল।

গান থামিল। আমি ভক্তিভরে, পুনরায় সে পবিত্র পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম। তিনি উর্দ্ধহস্তে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মধুরস্বরে কহিলেন, "কি চাও?"

আমি কিছুক্ষণ কোন উত্তর করিতে পারিলাম না। অনিমেষ নয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম। তিনি আবার স্নেহমাখা স্বরে কহিলেন, "বৎস! কি ভাবিতেছ? তোমার আশা পূর্ণ হইবে!"

আমি পরম পুলকিতচিত্তে, ভক্তিভরে, পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আবেগভরে কহিলাম, "দেব! আপনার আশীর্ব্বাদ যেন সফল হয়। আজ শুভক্ষণে আপনার দর্শন পাইলাম। আমার কাণে কাণে কে যেন বলিতেছে, 'এতদিনে তোর কালবিভাবরী প্রভাত হইল!' দয়াময়, দয়া করিয়া বলিয়া দিন, সংসারের জ্বালা হইতে কিরূপে অব্যাহতি লাভ করি? আমি ধনজন চাহি না, মানসম্ভ্রম চাহি না, ইহলোকের সুখসম্পদও কিছুই প্রার্থনা করি না,—চাই কেবল অন্তরের

তৃপ্তি। অন্তর্য্যামিন্! এ হতভাগ্যের অন্তর দেখিতেছেন, বলিয়া দিন্, কতদিনে আমি সফলমনোরথ হইব?”

তিনি কিছু গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, “বৎস, হ’তে উতলা হইও না। এ উতলার কাজ নহে। ধৈর্য্য ধর, সংযমী হও। আত্মসংযম ব্যতীত মানুষের আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। আত্ম-জ্ঞান লাভ না হইলে, মানুষের ভাগ্যে মহামিলনও ঘটে না। এই মহামিলন কি, পরে জানিবে।”

আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে, করুণস্বরে পুনরায় কহিলাম, “দেব, ঘটন-অঘটন সে ত আপনার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছাময়, পদাশ্রিত শরণা-গতকে বঞ্চিত করিবেন না,—এ অধমকে পায়ে ঠেলিবেন না! আজ হইতে আপনি আমার গুরু! আপনার আশীর্ব্বাদে”—

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, “গুরু? কে আর গুরু? রামের গুরু শিব, শিবের গুরু রাম! শিব রাম পরস্পর পরস্পরের গুরুশিষ্য। এ সংসারে সকলের গুরু,—সেই গুরুর গুরু—কল্পতরু সেই বৈকুণ্ঠবিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বৎস! তুমি বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হও!”

আমি ভক্তি-গদ্গদকণ্ঠে, আবেগভরে কহিলাম, “গুরুদেব! আর অধমকে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না। আজ হইতে আমি আপনার চরণে শরণ লইলাম। বলেন ত, সংসারের নিকটও জন্মের-মত বিদায় লইতে প্রস্তুত আছি। এ কারাগারে বন্দী থাকিতে আর আমার ইচ্ছা নাই।”

তিনি একটু হাসিলেন। পরে বলিলেন, “বৎস, তুমি যত সহজ মনে করিতেছ, এ কাজটা তত সহজ-সাধ্য নয়। মায়ার হাত এড়াইতে পারে, এ সংসারে এরূপ ভাগ্যবন্ত লোক কয়জন

আছেন? মায়ায় জগৎ সৃষ্টি, মায়ায় স্থিতি ও মায়ায় লয়। মায়ার জীব মায়ায় মুগ্ধ; এক মায়া ছাড়িয়া, আর মায়ায় আবদ্ধ হয়। মনে করে, স্বাধীন হইলাম! মহা ভ্রান্তি! মায়ায় যাহার অস্থি-মজ্জা-দেহ গঠিত, সে হইবে স্বাধীন? বাতুলের কথা! কবি যথার্থই প্রাণের তারে ঘা দিয়া গাহিয়াছেন,—"মায়ায় সূতোর জাল বুনেছে সৃষ্টিধর-জেলে!"

আমি একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "তবে কি দেব, এ অধম জনের পরিত্রাণ নাই?"

তিনি কহিলেন, "ও কথা অনেক দূরের। রাত্রি হইয়াছে, আজ গৃহে যাও। কৃষ্ণের সাধনা কর। কৃষ্ণের কৃপা ভিন্ন কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ হয় না। আর ঐ যে সংসারত্যাগের কথা বলিলে, উহাও একটা নূতন বাতুলতা। সংসার ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? বন? সেও ত সংসার-ছাড়া নয়। একমনে—এক প্রাণে কৃষ্ণের সাধনা কর! মানুষ নিজে কিছু করিতে পারে না, সকলই সেই কৃষ্ণের প্রসাদাৎ!"

এই বলিয়া, তিনি পুনরায় সেই বীণায় ঝঙ্কার দিলেন। দিগ্মণ্ডল কাঁপাইয়া গায়িলেন,—

"সকলই তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম কর তুমি মা, লোকে বলে করি আমি॥"

ভক্তির প্রস্রবণ ছুটিল, আমি তাহাতে ডুবিলাম; প্রাণ অপার আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিলাম। মনে মনে কহিলাম, "মা জগজ্জননি! সকলই তোমারই ইচ্ছা বটে! আমরা কে মা? তোমার যন্ত্রপুত্তলি বৈত নয়। মা! মনে যেন এই ভাবটি বদ্ধমূল হইয়া যায়।

গান থামিল। দরবিগলিতধারে আমার চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। পুনরায় ভক্তিভরে, সেই মহাপুরুষের পাদপদ্মে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম।

কিছুক্ষণ নীরব রহিলাম। মনে আশা, নিরাশা, বৈরাগ্য, ভয়, ভক্তি—একাধারে জাগিয়া উঠিল। একটু আবেগভরে কহিলাম, "গুরুদেব, অধমকে পায়ে ঠেলিবেন না। যদি কখন কৃষ্ণের করুণা পাই, সে আপনারই কৃপায়। কৃপাময়, এখন আর আমি অন্য ঈশ্বর জানি না,—তিনি অনেক দূরে,—এখন আপনিই আমার মূর্ত্তিমান ঈশ্বর! প্রভো! আজ আমার জীবন ধন্য হইল, আমিও ধন্য হইলাম।"

তিনি কহিলেন, "রাত্রি অধিক হইয়াছে,—আজ গৃহে যাও। কল্য এমনই সময়, এইখানে আমার সাক্ষাৎ পাইবে।"

আমি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া, বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

---

(৭)

এল-এ পরীক্ষার আর অল্পদিন আছে, এ সময়ে অধিক পরিশ্রম করিয়া পাঠাভ্যাস করা উচিত ; কিন্তু আমার জীবন-স্রোত এখন অন্যদিকে ফিরিল। সাংসারিক সুখ-দুঃখ ও উন্নতি-অবনতি আমার নিকট এখন অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল। প্রাণ উদাস হইয়া গেল ;—সুতরাং মনসংযম করিয়া আর পাঠাভ্যাসরত হইতে পারিলাম না। সকল দিন বিদ্যালয়েও উপস্থিত হইতাম না। লেখা-পড়ায় আমার উপেক্ষা প্রকাশ

পাইতে লাগিল। কিছুদিনের মধ্যে, পড়া-শুনা একরূপ বন্ধও করিয়া দিলাম। সকাল-সন্ধ্যা সকল সময়েই গুরুদেবের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলাম। মাতুল মহাশয় এ সকল দেখিলেন। দেখিলেন যে, আমার মনের গতি এখন অন্যদিকে ফিরিয়াছে। প্রথমতঃ তিনি আমাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক উপদেশও দিলেন। কিন্তু সকলই বৃথায় হইল। আমি উত্তরোত্তর তাঁর অবাধ্য হইতে লাগিলাম।

কাজেই, একদিন তিনি আমাকে স্পষ্টই বলিলেন, "প্রবোধ, যদি লেখাপড়া করিতে তোমার আদৌ ইচ্ছা না থাকে, তবে আর এখানে থাকিবার আবশ্যক কি? তোমার যাহা মনে হয়, কর। কিন্তু আমার এখান হইতে তোমার "অন্ন-জল" উঠিল।"

আমি নীরবে সকল কথা শুনিলাম। কিছুক্ষণ পরে কহিলাম, "ভাল, তাহাই হইবে,—আমি আজই আপনার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আপনি এতদিন আমাকে অন্নদান করিয়াছেন,—লেখা পড়া শিখাইয়াছেন, সেজন্য চিরদিন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিব। জ্ঞানকৃত কোন অপরাধ করি নাই; যদি অজ্ঞানতাবশতঃ কোন দোষ করিয়া থাকি, অবোধ পুত্রজ্ঞানে ক্ষমা করিবেন।"

প্রাতেঃ এই ঘটনা হয়, অপরাহ্নে আর এক ঘটনা ঘটিল। অপরাহ্নে আপন মনে নানারূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় এক টেলিগ্রাম পাইলাম। তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—"অবিলম্বে চলিয়া আসিবে। তোমার শ্বশুর মহাশয় ভীষণ বিসূচিকায় আক্রান্ত, বাঁচিবার আশা নাই। তোমাকে দেখিতে ইচ্ছুক।"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গুরুদেবের নিকট গেলাম। এলাহা-

বাঁদের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহার একখানি কুটীর;—আমাদের বাসা হইতে এক মাইল পথ ব্যবধান। তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "এখনই তোমার শ্বশুর মহাশয়কে দেখিতে যাও, অন্য কথা পরে হইবে।

সেই দিন সন্ধ্যার রেল-গাড়ীতেই আমি এলাহাবাদ ত্যাগ করিলাম। পরদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে গন্তব্য স্থানে পঁহুছিলাম।

আমাকে দেখিয়াই মায়া কাঁদিয়া উঠিল। আমার শ্বশ্রু-ঠাকুরাণীও আমাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা প্রবোধ, আসিয়াছ! আর কি দেখিতে আসিলে বাবা? সব ফুরাইয়াছে! জন্মের-শোধ আমার সিঁথীর সিঁদূর মুছিয়াছে।"

আমি সকলই বুঝিলাম। বুঝিলাম যে, শ্বশ্রুঠাকুর মহাশয় সকলকে ফাঁকি দিয়া গিয়াছেন। কিছুক্ষণ খুব কান্না-কাটী চলিল। আমি নতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। নীরবে, শতধারে আমার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতেই আবার এক দুর্ঘটনা;—শ্বশ্রুঠাকুরাণীও ঐ রোগে আক্রান্ত হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই 'দ্যাথ দ্যাথ' পড়িয়া গেল। চিকিৎসক আসিল, রীতিমত চিকিৎসাও চলিতে লাগিল; কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। রোগীর সর্ব্বশরীর হিমাঙ্গ হইয়া গেল। সেই দিনই রবি-কিরণের অন্তর্ধানের সহিত শ্বশ্রুঠাকুরাণীর আয়ুরবিও চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল।

অন্তিমকালে, তিনি, মায়াকে আমার হস্তে সঁপিয়া দিয়া

কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, আমার মায়াকে দেখিও। আমার যাহা কিছু রহিল, সকলই তোমার। তিনি একা বৈকুণ্ঠে গেছেন ;—তাঁর সেবা-সুশ্রূষার কষ্ট হইতেছে। আমি সেখানে তাঁর পদসেবা করিতে যাইতেছি।"

তারপর মায়াকে কহিলেন, "মা, আমি চলিলাম। কাঁদিও না। মানুষের হাতে তোমাকে দিয়া গেলাম। মরিতে আমার কষ্ট নাই।"

মায়া বিকলকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "মা, তোমাকে ভুলিয়া, বাবাকে ভুলিয়া, আমি কেমন করিয়া থাকিব ? মাগো ! আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও।"

পাষাণভেদী করুণস্বরে মায়া কাঁদিতে লাগিল। সে ক্রন্দনে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর চক্ষেও জলধারা দেখা দিল। কিন্তু তাহা আর গণ্ডস্থলে বহিতে পারিল না ; —যেখানকার, সেইখানেই মিশিয়া রহিল।

সময় বুঝিয়া সুবর্ণ দীপ হাসিয়া উঠিল। যেন ছিন্ন মেঘের কোলে ক্ষীণ সৌদামিনীর বিকাশ! তাহা আভাহীন, প্রভাহীন, শোভাহীন, প্রাণহীন। কিন্তু সে হাসি,—স্নেহের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, পরম করুণাধার, মায়ের সেই ম্লান হাসি, আজ মায়ার বক্ষে, বিষাক্ত শল্যের ন্যায় বিষম বাজিল।

অন্তিম-নিশ্বাস টানিতে টানিতে মা মায়াকে কহিলেন, "ছিঃ মা, অমন কথা মুখে আনিতে নাই। স্ত্রীলোকের পতির বাড়া মহা গুরু আর কেহ নাই। পতিই দেবতা, পতিই ঈশ্বর। পতি-সেবা ভিন্ন, সতী-নারীর আর ধর্ম্ম নাই। সেই পতি, তোমার রহিলেন,—আর তুমি বল, 'কেমন করিয়া থাকিব ?' ছিঃ মা !

অমন কথা আর মুখে আনিও না, আশীর্ব্বাদ করি মা,—পতির কোলেই যেন তোমার আয়ুঃ শেষ হয়!"

অতঃপর আমাকে কি ইঙ্গিত করিলেন; আমি তাঁর শিয়রে বসিলাম। অতি অস্পষ্টস্বরে "হরি হরি" বলিতেছেন, শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম, তাঁর অন্তিমকাল উপস্থিত। তখনই কয়েকজন প্রতিবেশীর সাহায্যে, তাঁহাকে তুলসীতলে আনিলাম। সকলে সমস্বরে "হরি হরি" বলিতে লাগিলাম;—এদিকেও অমনি, নীরবে নশ্বর-দেহ ত্যাগ করিয়া সতী সাধ্বী পতির অনুসরণ করিলেন!

বুঝিলাম, মায়ার বুকের একখানি হাড় খসিল!

---

(৮)

এই ঘটনার কিছু দিন পরে আর এক নূতন দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল। মায়ার পিতা-মাতার অন্তর্ধানের সহিত, আমাকে সংসার-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। জন্মাবধি আমার উপর দিয়া অনেক শোকের ঝড় বহিয়া গিয়াছে,—এখনও গেল। তজ্জন্য, আমাকে অধিক অধীর করিতে পারে নাই। তবে একমাত্র অল্প-বয়স্কা পত্নী লইয়া সংসার-বাস, আমার পক্ষে বিষম ভারবহ বোধ হইতে লাগিল। একটি অনেককালের বৃদ্ধা পরিচারিকা ছিল, সে-ই সমস্ত গৃহস্থালী কাজ-কর্ম্ম করিতে লাগিল। আমি বড় বিপদগ্রস্ত হইলাম। স্ত্রীকে লইয়া সর্ব্বদাই মুখোমুখি হইয়া থাকা, আমার পক্ষে বড় অসহ্য হইয়া উঠিল।

একদিন সন্ধ্যার পর, মনটা বড় খারাপ হওয়ায়, আমাদের গ্রামের প্রান্তসীমায় একটি বাগানে বেড়াইতে গেলাম। স্থানটি বড় মনোহর। চারিদিকে পুষ্পবৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ। তাহাতে নানা জাতীয় পুষ্প বিকশিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। বসন্তের প্রারম্ভ। মৃদু-মন্দ মলয় হিল্লোল সেবনে শান্তিহারা প্রাণ কতক জুড়াইল। সংসারের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, সংসারের অনিত্যতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে মনে কহিলাম,—"যাই হোক, এত দিন কতকটা স্বাধীন ছিলাম,—সংসারের জ্বালা কিছুই সহিতে হয় নাই,—আর এখন একেবারে পূরা গৃহস্থালী পাতিয়া বসিতে হইল। হায়, কেন বিবাহ করিলাম! নিজে অসুখী হইলাম,—সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকেও অসুখী করিলাম! বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে?"

ইত্যাকার চিন্তা মনে উদয় হইতেছে, এমন সময় হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিলাম; প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কে যেন কাণে কাণে বলিল,—"হতভাগ্য! এখানে বসিয়া কি ভাবিতেছ? ওদিকে পিশাচে যে, তোমার সর্ব্বনাশসাধন করিতে উদ্যত হইয়াছে!"

যেমনই মনে, এ অশুভচিন্তা উদয় হইল, অমনি শ্রীগুরু স্মরণ করিয়া উঠিলাম। ত্বরিতপদে বাটী প্রত্যাগমন করিলাম। গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার হৃৎতন্ত্রী কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে, অভিমানে, মর্ম্মান্তিক যাতনায়, বিকলকণ্ঠে কহিয়া উঠিলাম, "জগদীশ্বর! কি পাপে আমার এ সর্ব্বনাশ করিলে? গুরুদেব! এ বিপদে তুমি কোথায়!

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। দেখিলাম, আমার শ্বশুরের

বাটীর খিড়্কীর পথে. দুইজন পিশাচ, একটি কণকপদ্ম সুকুমারীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে। রমণীর হাত-মুখ সমস্ত বাঁধা। আমি চিনিলাম। বুঝিলাম, আমারই কপাল ভাঙ্গিয়াছে। সে অভাগিনী আর কেহ নহে—দুঃখিনী মায়া!

অকস্মাৎ হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। শরীর শতগুণে বলীয়ান্ হইল। বিপুল সাহসে, সেই দুর্দ্দান্ত দস্যুদ্বয়কে আক্রমণ করিলাম। সরোষে কহিলাম, "পিশাচ! তোদের কি ধর্ম্মের ভয় নাই?—জীবনে মমতা নাই?"

মায়াকে সেই অসুরদ্বয়ের করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করিলাম। তাহার সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলাম। মায়া আমাকে দেখিয়া যাতনা-জড়িত অস্ফুট চীৎকার করিয়াই আমার ক্রোড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এই অবসরে দুর্দ্দান্ত পিশাচদ্বয় আমাকে আক্রমণ করিল। একজন আমার মস্তকে লগুড় প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া পাপিষ্ঠের হাত ধরিলেন। জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "পিশাচ! আর এক পদ অগ্রসর হইবি, কি প্রাণ হারাইবি!"

হরি হরি! এ কাহার কণ্ঠস্বর? এ স্বর যে আমার পরিচিত! আমি চিনিলাম! বড় দুঃসময়ে ভগবান দেখা দিলেন! পতিতপাবন গুরুদেব এ সময় কোথা হইতে আসিলেন? তবে কি আমার কাতর-প্রার্থনা, অন্তর্য্যামীর সে রাজীবচরণে পঁহুছিয়াছে?

গুরুদেব সেই দস্যুদ্বয়কে আবার কহিলেন, "যদি প্রাণের মমতা থাকে, তবে অবিলম্বে এথান হইতে দূর হ!"

সে রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া, সে অসাধারণ বিক্রম অনুভব করিয়া, পিশাচদ্বয় প্রাণভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিল।

আমি যেন স্বপ্ন রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। ভয়, বিস্ময় ও ভক্তিতে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। মুখে একটিও কথা বাহির হইল না। নির্নিমেষ নয়নে সে অপরূপ মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। আমার অপাঙ্গ বহিয়া দরদর ধারে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল।

গুরুদেব কহিলেন, "বৎস! বিস্মিত হইতেছ?—আমি কোথা হইতে কিরূপে হঠাৎ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ভাবিতেছ? সে কথা পরে হইবে। এখন অন্তঃপুরে চল, তোমার পরিচারিকাও বন্ধনাবস্থায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া আছে।"

মায়া তখনও আমার ক্রোড়ে মূর্চ্ছিতা। গুরুদেব ও আমি কোনও রকমে, তাহাকে বাড়ীর মধ্যে আনিলাম। মুখে চোখে জল দিয়া ক্রমে আমি তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলাম। এদিকে গুরুদেবও পরিচারিকার বন্ধন মুক্ত করিয়া, তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইলেন।

অনুসন্ধানে বুঝিলাম, গ্রামের গুণধর জমিদার বাবুর ষড়যন্ত্রে এই পৈশাচিককাণ্ড ঘটিয়াছিল।

---

(৯)

যথা সময়ে গুরুদেব, একে একে আমার এই উপস্থিত বিপদ-কাহিনী শুনিলেন। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন,—"বৎস, আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি, সম্মুখে তোমার এক পরীক্ষা উপস্থিত। পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছ, ইহাতে সুখী হইলাম।

দেখ, সুখ-দুঃখ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব সুখে-দুঃখে সংযমী হওয়াই প্রকৃত পুরুষের লক্ষণ।"

আমি কিছু অসংযত-চিত্তে কহিলাম, "কিন্তু দেব, কোন্ পাপে, কার অভিশাপে, ভগবান্ আমার উপর দিয়া এত ঝড়—এত তুফান বহন করিতেছেন! জন্মাবধি শোকের সহিত যুদ্ধ করিয়া, জ্বলিয়া-পুড়িয়া হৃদয় খাক্ হইয়াছে; মনে মনে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি! তাহার উপর বিনা দোষে, এ হীন দুর্ব্বলের উপর প্রবলের যথেচ্ছাচার! বিধাতার এ কি বিচিত্র লীলা!"

গুরুদেব একটু গম্ভীরভাবে কহিলেন, "দেখ, বিধাতার লীলা বিচিত্রও বটে, আবার একটু ভাবিয়া দেখিলে, নাও বটে। সুখ-দুঃখ বা সম্পদ বিপদ যে কি, তাহা কি আমরা ঠিক বুঝিতে পারি? ফলাফল দেখিয়া ত কার্য্যের বিচার! কিন্তু কোন্ কাজের ফল কখন্ ফলিবে, তাহা কে বলিতে পারে? ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব, পর-মুহূর্ত্তের ঘটনায় অনভিজ্ঞ,—কার্য্যের ফলাফল বুঝিবার তাহার অধিকার কি? তোমার স্ত্রী অতি সুশীলা ও সতী-সাধ্বী। এই সাধ্বীর পুণ্যফলে তোমার ভাল বই মন্দ হইবে না। সাধুর বিপদ সম্পদেরই কারণ হয়। অধৈর্য্য হইও না। ভগবানের সর্ব্ব-মাঙ্গল্যে বিশ্বাসবান্ হও।"

এইরূপ আরও অনেক কথা হইল। গুরুদেব কিছুদিন আমার আশ্রমে অবস্থিতি করিলেন। শুভ দিনে, আমরা স্বামী-স্ত্রীতে, তাঁহার নিকট বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলাম। প্রাণ নববলে বলীয়ান্ হইল। অন্তরে পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম।

কিন্তু ভগবান আমাকে বেশী দিন দেশবাসী হইতে দিলেন না। জমিদার-বাবুর অত্যাচার, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

অগত্যা, গুরুদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, দেশ পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিলাম। স্থাবর-অস্থাবর সমুদয় ভূ-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, আমি শুভ-দিনে সপরিবারে এলাহাবাদ পঁহু-ছিলাম। এলাহাবাদ আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। সেখানে একটি বাটী ভাড়া লইলাম। গুরুদেব মধ্যে মধ্যে, আমাদের স্ত্রী-পুরুষকে দর্শন দিতেন। আমিও সকাল-সন্ধ্যা তাঁহার কুটীরে উপস্থিত হইয়া, তদীয় চরণ বন্দনাদি করিতাম। ক্রমে ক্রমে বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, ভাগবত, গীতা প্রভৃতি প্রচুর ধর্ম্মগ্রন্থ তাঁহার নিকট পাঠ করিতে লাগিলাম। এলাহাবাদের একটি ইস্কুলে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলাম। সামান্য আয়ে, সন্তুষ্টচিত্তে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম।

গুরুদেব মানুষ, কি ছদ্মবেশী কোন দেবতা, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার অলৌকিক সাধনা ও অভূতপূর্ব্ব কার্য্যকলাপ দেখিয়া, আমি অনেক সময় ভীত, চকিত, স্তম্ভিত বিস্মিত, ও মোহিত হইতাম। সাধনাবলে মানুষ কি তবে সত্য সত্যই এত উচ্চসীমায় উপনীত হইতে পারে? হায়, চক্ষের সম্মুখে এই উচ্চ আদর্শ,—হতভাগ্য আমি,—শূকরে কোহিনুর চিনিবে কিরূপে?

অনেক দিন অনেক চেষ্টা করিয়াও, গুরুদেবের কোন পরিচয় পাই নাই। প্রকৃত নাম-ধাম প্রকাশ করিতে, দেখিলাম, তিনি একান্ত নারাজ।

এখন আবার আমি আমার সেই আঁতের আসল ব্যথাটা বলিব। এক কথা আমি অনেকবার বলিতেছি। বুঝিতেছি, ইহাতে তোমাদের বিরক্তিবোধ হইতেছে। কিন্তু দেখ, ব্যথার

ব্যথী হইতে হইলে প্রাণে প্রচুর পরিমাণে সমবেদনা থাকা চাই, যথেষ্ট ধৈর্য্য ও ক্ষমাশীল হওয়ার আবশ্যক করে। আমি যে আগুনে পুড়িতেছি, অতি বড় শত্রুর গায়েও যেন সে আগুনের আঁচ না লাগে। তবে দুঃখীর কথা দু'দণ্ড কাণ পাতিয়া শুনিও, তাহাতে পুণ্য আছে। বিশেষ কবির কথাটি সর্ব্বদাই মনে রাখিও,—"দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সংবরণ করে না!"

আমার মনে এই বড় দুঃখ রহিয়া গিয়াছে, মায়াকে একদিনের জন্যও সুখী করিতে পারি নাই! আজ সে কথা মনে করিতেও আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। কত দিন কত ভৎর্সনা করিয়াছি; অভিমানে কত কুকথা বলিয়াছি;—অভাগিনী একদিনের জন্যও আমাকে মুখ ফুটিয়া একটি কথাও কহে নাই। প্রত্যুত্তর করা দূরে থাক্, ছলছল চক্ষে, মুখখানি কাঁদ-কাঁদ করিয়া ভূমিপানে চাহিয়া থাকিত। এক-একবার সেই করুণ আঁখি দু'টি আমার পানে চাহিত,—আমি সংসার ভুলিয়া যাইতাম। কিন্তু কেমন করিয়া ভালবাসার বস্তুকে ভালবাসিতে হয়; কিরূপ ব্যবহার করিলে ভালবাসা প্রকাশ পায়, তাহা আমি জানি না। ভালবাসার রহস্য বুঝি নাই। স্ত্রী-চরিত্র কি, তাহাও জানি না। না জানিয়াই আজ চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেছি।

মায়া, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। সংসারের কুটিলতা তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। পরের দুঃখ দেখিলে, সে, কাঁদিয়া আকুল হয়। ধর্ম্মে বিশ্বাস, গুরুজনে ভক্তি, দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধা, দীন-আতুরে দয়া, বালক-বালিকায় স্নেহ, সর্ব্বজীবে সমবেদনা,—মায়ার মর্ম্মে মর্ম্মে নিহিত। সেই সংসার-জ্ঞান-অনভিজ্ঞা,

সরলা, প্রেমময়ী ভার্য্যা, সংসারে অতি বিরল। কিন্তু হায়, আমি দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝি নাই!

মায়া আমাকে প্রাণান্তপণে ভালবাসিত। বুঝি, ভালবাসিয়া তাহার আশ মিটিত না। তাই আমি ঘুমাইলে, অভাগিনী ধীরে ধীরে আমার পদপ্রান্তে মাথা রাখিয়া, অনিমেষ নয়নে আমার মুখপানে চাহিয়া থাকিত। বুঝি, আমাকে দেখিয়া, অভাগিনীর দর্শন-পিপাসা মিটিত না। একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া, চক্ষু জল-পূর্ণ হইত; আর অমনি অজ্ঞাতে, সেই সুকান্তিময় সুকোমল গণ্ডস্থল বহিয়া টস্ টস্ করিয়া আমার পাদমূলে জল পড়িত। এক একদিন আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, আর সে দৃশ্য দেখিয়া মনে কত কি ভাবের উদয় হইত।

গ্রীষ্মকালে, রাত্রে, বাতায়ন-পথ মুক্ত থাকিত; আমি যতক্ষণ না ঘুমাইতাম, মায়া পাথার বাতাস করিত। ঘুমাইয়া পড়িলেও তাহার বাতাস থামিত না,—পাছে আমি ঘামিয়া পড়ি। এক একদিন আমি জাগরিত হইতাম। দেখিতাম, চন্দ্রালোক গৃহের ভিতর আসিয়াছে; সেই স্নিগ্ধ কিরণে প্রেমময়ীর সেই চাঁদমুখ-খানি বড় সুন্দর দেখিতাম। হায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়াও এখন সে সৌন্দর্য্যপ্রতিমা দেখিতে পাই না! এখন মনে হয়,—

"নয়ন অমৃত-রাশি প্রেয়সী আমার,
জীবন-জুড়ান-ধন হৃদি-ফুল-হার!
কি-জানি-কি ঘুম-ঘোরে, কি চোকে দেখেছি তোরে,
এ জীবনে বুঝি ওরে ভুলিব না আর!
তবুও ভুলিতে হ'বে, কি ল'য়ে পরাণ র'বে,
কাঁদিয়া চাঁদের পানে চাহি বারেবার!"

আবার কখন বা মনে হয়,—

"কি চোকে দেখেছি তারে!
সদা জাগে সে প্রতিমা কি আলোকে কি আঁধারে।
ধরি ধরি এই পাই, আর যেন সেথা নাই,
শূন্য প্রাণে শূন্যে চাই, বুক ভাসে শতধারে।

কখন বা ক্ষোভে, দুঃখে, নিরাশায়, অভিমানে, মনে মনে গাই,—

"আর মায়া বাড়া'ও না, আর লোভ দেখা'ও না,
আর ও মোহিনীবেশে ছ'ল না আমায়!"

কিন্তু হায়, আমার জীয়ন্তে সমাধি হইয়াছে! অভাগার এ মর্ম্মকথা কে শুনিবে?

---

(১০)

এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাল কাটিয়া গেল। এই দুই বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। গুরুদেব, মধ্যে মধ্যে নিরুদ্দেশ হইতেন, কোন সংবাদ পাইতাম না। কোথা হইতে হঠাৎ এক একদিন আসিয়া দর্শন দিতেন। সংসারাশ্রম ত্যাগের কথা পাড়িলেই তিনি আমাকে বুঝাইতেন। বুঝাইতেন যে, আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে সংসারাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। একাধারে যোগী ও ভোগী হইবার এমন বিশিষ্ট স্থান আর নাই। আমি তন্ময়চিত্তে, গুরুপদ ধ্যান করিয়া, তাঁহারই উপদেশমত জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম।

এই সময়ে এক দারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। গুরুদেব তখন এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে গিয়াছেন।

আজ সেই দুঃখের কাহিনী মনে করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে।

এলাহাবাদের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে আমার বাসা। আমার বাসার পার্শ্বেই একঘর দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার দুইখানি মাত্র কুটীর ছিল। সেই কুটীর দুইখানিতে স্ত্রী পুত্র লইয়া ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ব্রাহ্মণের সেই কুটীরে আগুন লাগে। তখন সকলে অঘোর নিদ্রায় অভিভূত। হঠাৎ দারুণ চীৎকার-কোলাহলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। মায়াও জাগিয়া উঠিল। উৎসুক চিত্তে জানেলার নিকট গিয়া দেখি, দাউ দাউ করিয়া ব্রাহ্মণের সেই কুটীর জ্বলিতেছে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী—স্ত্রীপুরুষ, সভয়ে অতি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, ব্যাকুলভরে "ত্রাহি মধুসূদন" রবে চীৎকার করিতেছেন।

এই লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়াই ত্বরিতপদে আমরা স্ত্রীপুরুষে তথায় উপস্থিত হইলাম। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সেই আকুলি-ব্যাকুলি ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, তাঁহাদের একটি অপোগণ্ড শিশু নিদ্রিতাবস্থায় এখনও গৃহমধ্যে আছে। আগুন ধূ ধূ জ্বলিতেছে। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, হা-হুতাশ করিতেছেন। আমি আর ক্ষণমুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া, সেই প্রজ্বলিত গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। এই সময়ে সেই দগ্ধগৃহের অর্দ্ধাংশ ভূমিসাৎ হইল। আমার প্রাণনাশের আশঙ্কা করিয়া, পতিপ্রাণা মায়াও সেই প্রজ্বলিত গৃহমধ্যে আমার উদ্ধার সাধনার্থ প্রবিষ্ট হইল। আমি অনেক কষ্টে, কোন রকমে, ব্রাহ্মণের শিশুটিকে বক্ষে ধারণ করিলাম; কিন্তু বাহির হইবার পথ পাইলাম না। অন্তরে শ্রীগুরুর পদারবিন্দ স্মরণ করিলাম।

বুঝিলাম, আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। কিন্তু—হরি হরি! একি, এ ঘোর সঙ্কটে কাহার শান্তিময় হস্ত আমার অঙ্গ স্পর্শ করিল? বহির্দ্দেশ হইতে গৃহের বৃতি ভাঙ্গিয়া, কে আমাকে উদ্ধার করিলেন? আমি চিনিলাম,—পতিতপাবন ভগবান আমার সম্মুখে! গুরুদেব এ সময়ে কোথা হইতে আসিলেন?

আমি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে, করুণ-নয়নে, তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "এখন, এ কৃতজ্ঞতা দেখাইবার সময় নয়। সম্মুখে তোমার মহা পরীক্ষা উপস্থিত। প্রস্তুত হও। তোমার সহধর্ম্মিণী, এই প্রজ্বলিত গৃহে অবরুদ্ধা হইয়াছেন। বুঝি, পতিব্রতার জীবন-সংশয়।"

ভয়-বিস্ময়-মোহে "এ্যাঁ, সে কি!" বলিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। গুরুদেব কিছু না বলিয়া, ব্যস্তসমস্ত হইয়া সেই প্রজ্বলিত গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মুমূর্ষুপ্রায় মায়াকে লইয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী তখনও শিরে করাঘাত করিয়া বিলাপ ও হাহাকার করিতেছিলেন। তারপর, শিশুকে দগ্ধহীন অক্ষত শরীরে রক্ষা করিতে পারিয়াছি দেখিয়া, তাঁহারা সাহ্লাদে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন সে আশীর্ব্বাদবাণী আমার কর্ণে স্থান পাইল না। সম্মুখে যে লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমার বুক ফাটিয়া গেল। প্রাণের স্তরে স্তরে শত বৃশ্চিকে দংশন করিল। বিকলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিলাম, "জগদীশ্বর, এ কি করিলে? গুরুদেব! কোন্ পাপে, কার অভিশাপে, বিনা মেঘে আমার মাথায় বাজ পড়িল! মায়া, মায়া!"—

মুখ ফুটিয়া সকল কথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না,—

যাতনাজড়িত একটা বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। ক্ষোভে, দুঃখে, আতঙ্কে, মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায়, বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম।

দেখিতে দেখিতে সে প্রজ্বলিত গৃহ ভূমিসাৎ হইল। তাহার সহিত ব্রাহ্মণেরও যথাসর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইয়া গেল। আর আমার?—আমার বুকের একখানি হাড় খসিল! আমার কাতরতা দেখিয়া, গুরুদেব গম্ভীরভাবে কহিলেন, "এখন কান্না রাখ,—অগ্রে মুমূর্ষুকে রক্ষা কর।"

আমি অধীরভাবে কহিলাম, "দয়াময়! যাহা করিতে হয়, আপনি করুন। আমি আর এখন আমাতে নাই। আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। হায়, মায়া আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছে,—আর আমি রহিলাম কেন?"

বস্তুতঃ, আমি যার-পর-নাই অধীর হইলাম। সরল-হৃদয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আমার এ অবস্থা দেখিয়া যে, অত্যন্ত কাতর ও কুণ্ঠিত হইলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহাদেরই কারণে মায়া আজ অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে! বুঝিলাম, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর ক্ষোভের আর সীমা নাই।

ভক্তবৎসল গুরুদেব, তৎকালোচিত উপায়ে, বিধিমতে মায়ার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে মায়ার চৈতন্য হইল। তখন আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া, অভাগিনীকে গৃহে লইয়া গেলাম। আমি ব্যাকুল প্রাণে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু হায়, নিষ্ঠুর ভবিতব্য!—আমি জানিতাম না যে, আমার সে কাতর প্রার্থনার উপর, অলক্ষ্যে, অদৃষ্ট, নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়াছিল।

(১১)

ঔরবজাত কন্যা অপেক্ষাও অধিক যত্নে, গুরুদেব, নিজহস্তে মায়াকে সেবা, শুশ্রূষা ও চিকিৎসাদি করিতে লাগিলেন। অরণ্যজাত এক প্রকার গুল্মের রস, মায়ার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলেন; ও স্বহস্তে আর-একটি-কি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া, সেবন করাইতে লাগিলেন।

ঔষধের অদ্ভুত শক্তি অবিলম্বে প্রকাশ পাইল। মায়া অনেকটা সুস্থ হইল। শরীরের দগ্ধ স্থানগুলি একে একে শুকাইয়া আসিল। কেবল বুকের একখানি ঘা আরোগ্য হইল না। সেই ঘা-ই অভাগিনীর কালস্বরূপ হইল। এই সময়ে মায়ার একটু একটু জ্বর হইতে লাগিল। আমি তাহাতে ভীত হইলাম। একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুদেবকে কহিলাম, "দয়াময়, তবে কি মায়া আমাকে ফাঁকি দিয়া যাইবে? দেব, সত্য বলুন,—মায়ার জীবন রক্ষা হইবে কি না!"

তিনি কিছুক্ষণ নিরুত্তর রহিলেন। পরে গম্ভীরভাবে কহিলেন, "জীবন-মরণ ঈশ্বরের হাত। যে দিন মানুষের আয়ু ফুরাইবে, স্বয়ং ধন্বন্তরি আসিলেও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। এক কাজ কর;—বিন্ধ্যাচলের নিকটে একটি ক্ষুদ্র কাননে, আমার একখানি ক্ষুদ্র কুটীর আছে, তোমার সহধর্ম্মিণীকে সেই খানে লইয়া যাও। সে স্থান অতি স্বাস্থ্যকর। আব্-হাওয়ার গুণে অনেক উৎকট রোগও বিনা চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। অতএব অগ্রে স্থান পরিবর্ত্তন আবশ্যক। বৎস, অত উতলা হইও না; সংযমী হও। সম্মুখে তোমার মহা পরীক্ষা

উপস্থিত। সে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। বালকের ন্যায় অত অধীর হইলে চলিবে কেন? ভবিতব্য কে খণ্ডন করিবে?"

আমি আর কোন প্রত্যুত্তর করিলাম না,—করিতে সাহসী হইলাম না। বিনা-বাক্যব্যয়ে, তাঁহার পদানুসরণ করিতে লাগিলাম।

পরদিন প্রাতেই আমরা এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিলাম। জন্মশোধ মায়াকে তথা হইতে লইয়া গেলাম। বিন্ধ্যাচলে উপস্থিত হইয়া, গুরুদেবের সেই কুটীরখানিতে অবস্থান করিতে লাগিলাম। প্রাণান্তপণে মায়াকে সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। বুঝি এই অন্তিমে, অভাগিনীর জীবনের সেই শেষ সময়ে, প্রকৃত ভালবাসার আস্বাদ পাইয়াছিলাম। বুঝি একটু প্রাণের-বন্ধন অনুভব করিয়াছিলাম! স্নেহমাখা দু'টা সোহাগের কথা পাড়িয়া, ভাবী সুখের কল্পনা করিয়া মায়াকে প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা পাইলাম। কখন বা অভাগিনীকে জন্মেরমত হারাইব ভাবিয়া, অধীর হইয়া উঠিতাম। আর সেই সময়ে, আমার অজ্ঞাতে গণ্ডস্থল বহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িত। সে উত্তপ্ত অশ্রু, মায়ার পাংশুময় কপোলে পড়িলে, সে শিহরিয়া উঠিত। বংশীরবে যেমন হরিণী শিহরিয়া উঠে, সেইরূপ শিহরিয়া উঠিত। বুঝি, মনে মনে ভাবিত, সে জন্মের-মত চলিয়া যাইবে বলিয়া, আমি কাঁদিতেছি। অমনি সেই করুণাময়ী ক্ষীণকণ্ঠে কহিত, "ছিঃ, তুমি কাঁদিও না! কাঁদিলে যে আমার অকল্যাণ হয়। যখন এ পৃথিবীতে আসিয়াছি, তখন একদিন ত মরিতেই হইবে। সেজন্য আমার দুঃখ নাই। তবে দুঃখ এই, আমি বিনা তপস্যায় তোমার মত প্রাণের ঠাকুরকে পাইয়াও বেশী দিন হৃদয়া-

সনে বসাইতে পারিলাম না। তোমাকে মনে হইলে, বড় আশায়, আমার আবার বাঁচিতে সাধ যায়!”

কথা শুনিয়া আমি নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলাম। প্রেম-প্রতিমা সেই করুণ-কণ্ঠে আবার কহিল, “স্বামিন্! কাঁদ কেন? আমার বাড়া জোর-কপাল আর কার্ আছে? পতির পায়ে মাথা রাখিয়া যে রমণী মরিতে পায়, সে ত ভাগ্যবতী! হৃদয়ের আরাধ্য-দেবতা তুমি,—হৃদয় আলো ক'রে দাঁড়াও আমার সম্মুখে,—আমি প্রাণ ভ'রে তোমায় দেখি! প্রাণেশ্বর! তোমায় যত দেখি, ততই আমার দর্শন-পিপাসা বাড়িয়া উঠে!”

এইরূপে প্রায় একমাস কাল অতিবাহিত হইল। রোগ, কখনও অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, কখন বা কিছু হ্রাস পায়। গুরুদেব, সপ্তাহকাল পরে কোথায় নিরুদ্দেশ হইলেন। প্রস্থানকালে আমাকে উপদেশ দিয়া গেলেন, “বৎস, অধৈর্য্য হইও না। সর্ব্বমাঙ্গল্যে বিশ্বাসী হও। যাহা হইবার, তাহা হইবে,—তজ্জন্য মনের শান্তি হারাইও না। আমি এখন কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে চলিলাম। কার্য্যকালে আমার দর্শন পাইবে। তোমার শুভ প্রারব্ধকাল আগতপ্রায়।”

গুরুদেব প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার আশ্বাসবাক্যে আমি ধৈর্য্য ধরিতে পারিলাম না। মন যার-পর-নাই উতলা হইল। মায়াকে জন্মেরমত হারাইব ভাবিয়া, আমি অন্তরে গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। শতধারে আমার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। মায়ার

প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। আমি পাষাণে বুক বাঁধিলাম।—বাঁধিলাম?—না, বাঁধিয়াছি মনে করিলাম?

স্বর্ণদীপ হাসিয়া উঠিল। বুঝিলাম, আজ দীপ নির্ব্বাণ হইবে।—বুঝিলাম, আমার সোণার-তরী আজ ডুবিবে! মায়া প্রলাপ কহিতে লাগিল,—"ঐ দেখ, মা আমার রাজরাজেশ্বরী-বেশে, সোণার সিংহাসনে, বাবার বামে বসিয়া স্বর্গ হইতে নামিতেছেন!—এই যে আমারই কাছে আসিতেছেন! মা, মা, আমাকে কি লইয়া যাইবে? তবে চ'ল মা, যাই!—বেলা গেল!"

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না;—উদ্‌ভ্রান্তভাবে, বিকলকণ্ঠে কহিয়া উঠিলাম,—"প্রাণাধিকে, তুমি কোথায় যাইবে!"

স্বর্ণ-দীপ আবার হাসিয়া উঠিল। এবার অতি ক্ষীণকণ্ঠে মায়া কহিল, "প্রাণেশ্বর! কাঁদ কেন? তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোথা যাইব? তোমায় আমায় ত ভিন্ন হইবার কথা নয়। দৈহিক সম্বন্ধ ঘুচিবে বটে, কিন্তু এই দেহের ভিতরে যে প্রাণ আছে, আমি সেই প্রাণ লইয়া অহর্নিশ তোমার কাছে কাছে থাকিব! তুমি এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের যে দিকে চাহিবে, আমায় দেখিতে পাইবে! তোমার কৃপায় আমি এ তত্ত্ব বুঝিয়াছি। প্রভু, আজ কেন আত্মবিস্মৃত হইতেছ?"

মূর্ত্তিমতী বীণাপাণীর ন্যায় নিখিল-শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া মায়া আমাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অবিনশ্বরত্ব বুঝাইল। বুঝিলাম, গুরুদেবের শিক্ষাদান নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু তখন আমি শোকে মুহ্যমান,—এ তত্ত্ব-কথা আমার বুকে বিদ্ধ

হইল না। আমি অধীরভাবে আবার চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম, "গৃহলক্ষ্মী আমার! আমাকে ফাঁকি দিয়া, কোথা যাইতেছ?"

মায়া অন্তিম-নিশ্বাস টানিতে টানিতে আরও ক্ষীণকণ্ঠে, আরও অস্পষ্টভাবে কহিল, "প্রাণেশ্বর! মা-আমার সতী সাধ্বী;—আজ সেই সতীর আশীর্ব্বাদ সার্থক হইল! মা-আমার বলিয়াছিলেন,—'যেন পতির কোলেই তোমার আয়ু শেষ হয়।' আঃ! আজ আমি সুখে মরিতে পারিব। প্রাণেশ্বর! আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্ম জন্ম তোমাকেই স্বামী পাই।"

প্রেমময়ী আমাকে কি ইঙ্গিত করিলেন। আমি বুঝিলাম। ধীরে ধীরে সাধ্বীর শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কম্পিতহস্তে, ধীরে ধীরে আমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া, মায়া, আপন মস্তকে ও জিহ্বায় স্পর্শ করিল। আমি চিত্রার্পিত স্থিরনেত্রে সতী-প্রতিমার সেই শেষদৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সতীর চক্ষু কপালে উঠিল; সে সময় আমার চক্ষুও বিস্ফারিত এবং পলকহীন হইল। জন্মের শোধ সেই চারিচক্ষে মিলন হইল। সে চারিটিই ডাগর চক্ষু। যেমনই আমার চক্ষু ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া, কয় ফোঁটা গরম রক্ত পড়িল,—হরি! হরি! হরি! অমনি আর একজনও অনন্তকালের জন্য দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল! ব্রহ্মাণ্ডের বিনিময়েও সে চক্ষু আর খুলিবে না!

বহুক্ষণ ধরিয়া সেই শবদেহে পড়িয়া বিহ্বলচিত্তে কাঁদিতে লাগিলাম। শেষে ব্যাকুলভরে ইষ্টদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলাম, "দয়াময়! এ বিপদে কোথা তুমি?"

অতঃপর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আমি গ্রন্থের প্রারম্ভেই

বলিয়াছি। সেই সোণার প্রতিমা শ্মশানে লইয়া গিয়া, যথাবিধি সৎকার করিয়া, ভাঙ্গা বুকে গঙ্গা তটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে দূরে গুরুদেবের সেই প্রাণারাম সঙ্গীত শুনিতে পাইলাম। দুঃসময়ে পতিতপাবনকে দেখিয়া আমার মনোভাব যেরূপ হইয়াছিল এবং সে সময়ে তিনি আমাকে যে সব উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাও বলিয়াছি। এইবার আমার জীবনের সেই "মহামিলনের" কথা বলিয়া, এই ক্ষুদ্র দুঃখকাহিনীর পরিসমাপ্তি করিব।

---

(১২)

গুরুদেব আমাকে স্বদেশ যাত্রা করিতে অনুমতি দিয়া কহিলেন, "ঠিক আর এক বৎসর পরে ঐ শ্মশানে—যেখানে তোমার নবজীবন লাভ হইয়াছে—সেই মহাস্থানে, আমার সাক্ষাৎ পাইবে। ঐ স্থানে তোমার আমার মহামিলন হইবে

তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, পদব্রজে নানাস্থান ভ্রমিয়া, বহুদিন পরে জননী-জন্মভূমি দর্শন করিলাম। প্রথম প্রথম মায়ার শোক বুকে বড়ই বাজিতে লাগিল। কোন কার্য্যেই মনঃসংযোগ করিতে পারিতাম না। অহর্নিশ সেই ধ্যানে—সেই জ্ঞানে জীবন অতিবাহিত করিতাম। কিন্তু পতিতপাবনের করুণাগুণে আমার চৈতন্যলাভ হইল। বুঝিলাম, সকলই আসক্তি ও মায়ার খেলা বটে! যাহাই হউক, এই আসক্তি ও মায়াবলেই কালে আমি সেই জগজ্জননী মহামায়াকে দর্শন করিলাম! দেখিলাম, সংসারের সর্ব্বত্রই সেই মহামায়া! আমার প্রাণাধিকা,

জীবনসর্ব্বস্ব, প্রেমময়ী, প্রিয়তমার স্মৃতি হইতেই ত আমার নবজীবন লাভ হইল! শত্রু মিত্র, সুন্দর কুৎসিত, সৎ অসৎ, পুণ্যবান্ পাপী—সকলকেই এখন আমি এক চক্ষে দেখিতে লাগিলাম। সকলকেই আপনার জ্ঞান হইল;—'পর' বলিয়া সংসারে আর কেহই রহিল না। জীবন ধন্য হইল। মন অপার আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। আপনার ক্ষুদ্র আমিত্ব হারাইয়া, এ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড 'আমিময়' দেখিতে লাগিলাম। সর্ব্বভূতেই প্রিয়তমার সেই পবিত্র স্মৃতি উদ্ভাসিত হইতে লাগিল।

দেশে আসিয়া পরিচিত অপরিচিত সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমার চিত্তের সাধুতা দেখিয়া, সকলে আমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি আবার বিন্ধ্যাচলে পঁহুছিলাম।

* * * * *

কিন্তু একি!—একদিন গভীর নিশীথে, সেই শ্মশানপার্শ্বস্থ স্রোতস্বতী সৈকতে বসিয়া আপন মনে গান করিতেছি, এমন সময় ঠিক মায়ার মত একটি প্রেমময়ী মূর্ত্তি, এলোকেশে—মোহিনী বেশে, ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে দৃশ্য দেখিয়া আমার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে সে মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলাম। মূর্ত্তি সরিয়া গেল।

কিন্তু এবার দেখি,—হরি হরি! এ কি দেখি! আ-হা-হা, কি অপরূপ রূপ! প্রাণ ভ'রে গেল! দশ দিক আলো ক'রে কে এলি মা! মা, মা! এত দিনে কি তোর অকৃতী সন্তানকে মনে পড়িল মা? গুরুদেব! দীননাথ! এ শুভদিনে কোথা

তুমি? পতিতপাবন, দেখে যাও প্রভো, জগজ্জননী আমায় কোল দিয়াছেন!

অকস্মাৎ সে স্থান আর এক জ্যোতির্ম্ময় আলোকে আলোকিত হইল। শিবানী ধীরে ধীরে শ্মশানে চলিলেন। ঠিক সেইখানে—যেখানে এক বৎসর পূর্ব্বে আমার জীবন-প্রতিমা পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, সেই চিরস্মরণীয় পূত স্থানে জগজ্জননী শ্যামামূর্ত্তিতে দিক্ আলো করিয়া দাঁড়াইলেন! আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। গুরুদেবও ঠিক সেই সময়ে, সেই সৌম্যমূর্ত্তিতে, বীণায় ঝঙ্কার দিয়া গায়িতে গায়িতে, অকস্মাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বর্গ-মর্ত্ত তখন এক হইয়া গেল! গুরুদেব গায়িতে লাগিলেন,—

"যশোদা নাচা'ত কোলে (ওমা) ব'লে নীলমণি।
সে রূপ লুকা'লি কোথা, করালবদনি! (শ্যামা)।"

হরি হরি! দেখিতে দেখিতে চকিতের ন্যায়, মায়ের সে মোহিনী-মূর্ত্তি আবার ব্রজের সেই সাধের গোপাল-মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। মরি মরি, কি অপরূপ রূপ! ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-বেশে নটবর শ্যাম, মোহন-মালা গলায় দিয়া, আর সেই মোহন-মুরলী মোহন করে লইয়া "রাধে রাধে" বলিয়া বাজাইতেছেন! সেই মোহন বাঁশরীর প্রতি রন্ধ্র হইতে বাহির হইতেছে,—"জয় রাধে, শ্রীরাধে!" আহা, কি অপূর্ব্ব সুর! প্রাণ ভ'রে গেল! দয়াময়, আবার বাজাও—"রাধে, রাধে, রাধে!"

এ অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া, আমার অপাঙ্গ বহিয়া, দরদর ধারে, আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। আমি নির্নিমেষ নয়নে সেই অলৌকিক দেব-লীলা দেখিতে লাগিলাম।

এইবার গুরুদেব পরম প্রীতিভরে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস, বলিয়াছিলাম না, ঠিক আর এক বৎসর পরে, এই স্থানে তোমার-আমার মহামিলন হইবে! আজ সেই মহামিলন হইল! আজ তুমি নবজীবন লাভ করিলে!"

অতঃপর, আবার সেই বীণায় ঝঙ্কার দিয়া, গুরুদেব, শ্রীজয়-দেবের সেই সুধার-সমুদ্র মন্থন করিলেন,—

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল
কলিত ললিত বনমাল। জয় জয়, দেব হরে॥

দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন
মুনিজনমানসহংস। জয় জয়, দেব হরে।

কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন
যদুকুলনলিনদিনেশ। জয় জয়, দেব হরে।

মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন
সুরকুলকেলিনিদান। জয় জয়, দেব হরে।

অমলকমলদললোচন ভবমোচন
ত্রিভুবনভবননিধান। জয় জয়, দেব হরে॥

জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ
শমরশমিতদশকণ্ঠ। জয় জয়, দেব হরে।

অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর
শ্রীমুখচন্দ্রচকোর। জয় জয়, দেব হরে।

* * * * *

আমি কোথায়? এই কি সেই শ্রীবৈকুণ্ঠধাম?—যেখানে ভক্তবৃন্দ অহর্নিশ সেই পরা-ভক্তি-সমুদ্রে ডুবিয়া থাকেন? এই

কি সেই গোলকবিহারী, গোপিজনবল্লভ,—বৈষ্ণবের সর্ব্বস্বধন? আর এই কি আমার সেই জীবনের পথ-প্রদর্শক, সংসার-সমুদ্রে ধ্রুবতারা শ্রীগুরুদেব?—যাঁহার করুণাবলে ইহ সংসারেই স্বর্গ-লাভ হয়?

হরি হরি!! কোথা আমি? একি স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল, না মায়া?

সমাপ্ত।

লীলা।

(১)

বিল্বগ্রামে একদিন কতকগুলি স্ত্রীলোক একত্র দলবদ্ধ হইয়া শিবমন্দিরে যাইতেছিল। গ্রীষ্মকাল, সময়—মধ্যাহ্ন। সূর্য্যের প্রখর রশ্মিমালায় চারিদিক ঝলসিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে এক একবার একটু বাতাস বহিতেছে, যেন মালসাখানেক আগুন কে গায়ে ঢালিয়া দিল বোধ হইতেছে। "রবির তাপে চাঁদনী ফাটে"—তাও বরং সয়,—কিন্তু সেই পথের ধূলি-বালির জ্বালা সহ্য করা বড় শক্ত কথা! উপরওয়ালা মনিবের মুখ-ভারি সহ্য করা যায়, কিন্তু তাঁর সেই পোষা-বিড়াল—নন্দদুলাল—খাস্‌মো-সাহেব বাবুর ভ্রুকুটী-ভঙ্গি একান্ত অসহ্য।

এই দুপুর রৌদ্রে, ঝিম্ ঝিম্ সময়ে, পশু পক্ষীও তৃষ্ণায় "টা টা" করিয়া যে যার "আস্তানায়" অবস্থিত; কিন্তু মেয়েমানুষগুলো যেন কি!—ঐ সারি গাঁথিয়া প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, যুবতী, বালিকা—একদল চলিতেছে! সেই অগ্নিময় ধূলি-বালি, কাঁটা-খোঁচার মত পায়ে ফুটিতেছে, সে দিকে বড়-একটা ভ্রুক্ষেপ নাই,—হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। মাথায় এক এক খানা গামছা;—বাড়ী হইতে আর্দ্রাবস্থায় আনা হইয়াছিল বটে; কিন্তু এইটুকু আসিতেই তাহা শুকাইয়া গিয়াছে। একটি বালিকা, পথশ্রমে ক্লিষ্ট হইয়া তাহার মাতামহীকে কহিল,

"দিদি-মা, আর কতদূর? আমি যে আর হাঁটতে পারি না দিদি-মা!"

দিদি-মা কহিল, "ঐ বাবার মন্দির দেখা যাচ্চে। এস দিদি,—তুমি আমার কোলে এস!"

মাতামহী, দৌহিত্রীটিকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। কহিলেন, "তুমি যে দিদী বায়না নিলে, হেঁটে যাবে! আগে কোলে উঠতে চাওনি, কেন ভাই?"

মনে মনে কহিলেন, "আহা দুঃখিনী রে! তোদের ভাবনায় আমিও ম'লেম।"

বর্ষীয়সী বিধবা একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু তখনই আবার সেই কুসুম-কম দৌহিত্রীটির চাঁদমুখে দুটা চুমা খাইলেন।

আর বাকী স্ত্রীলোকগুলি এ-কথা সে-কথা কহিতে কহিতে গন্তব্য-স্থানে উপনীত হইল।

---

(২)

এই গ্রামে খুব বড় একটি দীঘি আছে। দীঘির জল বড় ভাল,—নির্ম্মল, স্নিগ্ধ, ঢল-ঢল। জলে মুখ দিলে, মুখ দেখা যায়। গ্রামের সকলেই এই দীঘির জল ব্যবহার করিয়া থাকে। দীঘির তীরে সারি সারি অনেক নারিকেল, সুপারি, বকুল ও আম্র-বৃক্ষ। তাহার শীতল ছায়ায় আতপতাপক্লিষ্ট গো ও গো-পালকগণ বিশ্রামলাভ করিতেছে। অদূরেই একটি শ্যামল মাঠ দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

দীঘির পরপারেই একটি শিব-মন্দির। মন্দিরটী অনেক দিনের পুরাতন,—ভগ্নপ্রায়। মন্দিরের গায়ে শেওলা ও

আঁরণ্যলতা আশ্রয় লইয়াছে; দুই এক স্থান ফাটিয়া-চটিয়া হাঁ হইয়া গিয়াছে, একটু-আধটু ভাঙ্গিয়া খসিয়াও পড়িতেছে। দুই প্রার্শ্বে বহুকালের দুইটি অশ্বথ ও বটবৃক্ষ। প্রকাণ্ড বিটপী-দ্বয় বহু শাখা-প্রশাখায় পরস্পর জড়িত হইয়া আছে। মন্দিরটি যেন তাঁহাদের সঙ্গের সাথী। ভূমি হইতে আঁকিয়া-বাঁকিয়া অসংখ্য শিকড় মন্দিরের চারি দিকে আশ্রয় লইয়াছে। সেই সকল শিকড় গজাইয়া এবং মূল শাখা হইতে 'নামনা' বাহির হইয়া, আবার অসংখ্য 'বংশধর' উৎপত্তি হইতেছে। তাঁহারাও স্বতন্ত্র এক একটি অশ্বথ-বট! ফল কথা, মন্দিরটি না লইয়া আর ইহাঁরা এখান হইতে নড়িতেছেন না!

অশ্বথ-বটের স্নিগ্ধ ও ঘন ছায়ার মাঝে এই শিব মন্দির। স্থানটি বড় মনোরম, সুখ-শান্তিময় ও প্রীতিপ্রদ,—বিশেষতঃ এই গুমট গ্রীষ্মের দিনে। স্ত্রীলোকগুলি এখানে আসিয়া যেন ধড়ে প্রাণ পাইল। "আঃ! বাঁচলুম বাবা" বলিয়া কেহ বসিয়া পড়িল, কেহ শুইয়া পড়িল, কেহ কেহ বা ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম-চ্ছলে, কিছুক্ষণের জন্য দম ফেলিয়া বাঁচিল। মন্দিরের পুরুত-ঠাকুর, একত্রে অনেকগুলি স্ত্রীলোক দেখিয়া তাঁরই দু'পয়সা আয়ের সংস্থান বুঝিয়া, সাগ্রহে, "এস মায়েরা এস" বলিয়া সেই বৃক্ষতলে একটা মাদুর বিছাইয়া দিলেন। ব্যস্তবাগীশ হইয়া তখনই এক কলসী স্নিগ্ধ জল ও একটা বড় লোটা হাজির করিলেন। এ-কথা সে-কথায় আপ্যায়িত করিয়া পরে কহিলেন, "তা' মা-ঠাক্‌রুণরা, বাবার মন্দিরে এসেছেন, বাবাকে দেখে যান।"

একজন প্রবীণা কহিল, "হাঁ, অবিশ্যি। এখানে এলুম, আর বাবাকে দেখে যাব না?"

পুরুত-ঠাকুর মাথা নাড়িয়া "তা ত বটেই—তা ত বটেই" করিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন যুবতী সেই প্রবীণাকে কহিল, "তা রাঙা দিদি, তুমি বল না, বাবাকে ত দেখ্‌বই,—কিন্তু আগে আমরা সেই সন্ন্যাসী-ঠাকুরকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।"

কথাটা অবশ্যই পুরুত-ঠাকুরের কর্ণগোচর হইল। তিনি মস্তক-কণ্ডূয়ন করিতে লাগিলেন। বুঝি মনে মনে এই ভাবিতে লাগিলেন, "তবেই ত দেখ্‌ছি, আমার দফা রফা! সন্ন্যাসী বাবাজীকে দিয়ে-থুয়ে যে আমার জন্যে কিছু থাকে, এমন ত বোধ হয় না। এখন বুঝ্‌ছি, বাবাজীকে 'আস্থানা' না দেওয়াই ছিল ভাল।"

প্রকাশ্যে কহিলেন, "তা আসুন না আপনারা, সন্ন্যাসী বাবাজী ওখানে চুলি জ্বেলে ব'সে জপ কচ্ছেন।"

বস্তুতঃ, মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটু স্থান অধিকার করিয়া জনৈক সন্ন্যাসী বিরাজ করিতেছেন। পরিধানে কৌপিন বাস, দেহ ভস্মাচ্ছাদিত, মস্তকে জটাজুট লম্ববান। সম্মুখে একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া, বাবাজী ক্রিয়ায় নিযুক্ত।

সপ্তাহকাল হইল, সন্ন্যাসী এখানে আসিয়াছেন। পাড়াগাঁয়ে একজন সন্ন্যাসী-মহান্ত উপস্থিত হইলেই জনতা হয়। বিশেষ, যদি সেই মহাপুরুষের একটু-আধটু গণনা-শক্তি বা 'শিকড়-মাকড়ের' ক্ষমতা থাকে, তবে ত অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁর পসার জমিয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সন্ন্যাসী বাবাজী ঠিকঠাক ভাগ্য-ফল গণনা করিতে পারেন শুনিয়া, দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন। বাবাজীও

বুজরুকি চালাইতে ছাড়িলেন না ;—কাহারও ধনোপার্জ্জনের পথ, কাহারও নষ্টধন উদ্ধারের উপায়, কোন রমণীর মৃতবৎসার ঔষধ, কাহাকেও বা বশীকরণ মন্ত্র,—এইরূপ হরেকরকমের বুজ-রুকি দেখাইয়া তিনি দুই এক দিনের মধ্যেই বিল্বগ্রামে আপন পসার জমাইয়া বসিলেন। ভদ্রমহিলাগণের মধ্যাহ্নকাল ব্যতীত অন্য সময়ে বড় একটা সুবিধা ঘটিয়া উঠে না,—তাই তাঁহারা আহারাদির পর সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখিতে আসিতেন। আজও এই একদল আসিয়া যুটিলেন।

---

(৩)

স্ত্রীলোকগণ সন্ন্যাসীর সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। বাবাজীও কি একটা হিন্দিবাৎ আওড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর, যথাসময়ে, একে একে সকল স্ত্রীলোকের হাত দেখিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, চতুর বাবাজী, সকলেরই মনের মত কথা বলিতে লাগিলেন। কথা, আধা হিন্দী ও আধা বাঙ্গলাতেই চলিতে লাগিল। সন্ন্যা-সীর মুখে 'রা' শব্দ ফুটিতে-না-ফুটিতে, স্ত্রীলোক দল, "হ্যাঁ গা বাবা, হ্যাঁ,—তাই বটে" বলিতে থাকে, আর বাবাজীর গণনাও তাহাতে বেশ জমিয়া যায় ;—নানারূপ সংস্কৃত ও হিন্দী শ্লোক—মাথামুণ্ড আওড়াইয়া বাবাজী প্রতিপন্ন করেন, তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অভ্রান্ত—বেদবাক্য।

হাত-দেখা শেষ হইলে পর, সন্ন্যাসী বাবাজীর ঔষধ বিত-রণের পালাও শেষ হইল। তখন সকলে প্রার্থিত-বস্তু-লাভাশায়

সন্তুষ্ট হইয়া, বাবাজীকে কিছু কিছু প্রণামী দিল। বাবাজীও "শিব শিব" বলিয়া তাহা থলিতে পূরিলেন।

পুরুত-ঠাকুর মহাশয় তখন বাবাজীর জন্য সিদ্ধির আয়োজনে নিযুক্ত ছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বাবাজীর কথা আধা হিন্দী, আধা বাঙ্গলা;—আমরা কিন্তু তাঁর কথা খাঁটী বাঙ্গলাতেই বলিব;—তাহাতে লেখক-পাঠক দু'য়েরই সুবিধা।

যে প্রবীণাটি সেই ছোট মেয়েটিকে কোলে করিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি এতক্ষণ অবধি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "মা জি! সকলে হাত দেখালেন. তুমি চুপ করে রইলে যে? আর ঐ মেয়েটির হাতও যে দেখালে না?"

প্রবীণা একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "হাঁ, এখানে এসেছি যখন, দেখাব বৈ কি!"

পরে দৌহিত্রীটিকে কহিলেন, "দেখাও ত ভাই লীলা;—তোমার হাতখানা। সন্ন্যাসী-ঠাকুরকে নমস্কার কর।"

বালিকা, ডাগর চক্ষু দু'টি মেলিয়া সন্ন্যাসীর পানে চাহিয়া রহিল: সন্ন্যাসীও একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিনী রমণীগণ অমনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আহা, এ মেয়েটি বড় অনাথিনী,—জন্ম-দুঃখিনী! যখন লীলা মায়ের পেটে, তখন ওর বাপ বিবাগী হ'য়ে কোথায় চ'লে যায়। আজ ৬।৭ বছর হলো, কোন উদ্দেশ নাই। মা ওর কেঁদে কেঁদে মরার-মত হ'য়ে আছে। পোড়া কপালী কাকেও মুখ দেখায় না।, আপনার দুঃখে আপনি গুমরে মর্ছে।"

ইত্যাকার দীর্ঘ ভূমিকা ফাঁদিয়া তাঁহারা লীলার মার দুঃখে একেবারে গলিয়া গেলেন। কিন্তু এর আগে কেউ একবারটিও সে কথার উচ্চ-বাচ্য করেন নাই। যে যার আপন আপন হাত দেখাইতেই ব্যস্ত ছিলেন। লীলার মাতামহী কিন্তু কন্যার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া এবং উপস্থিত পাঁচজনের মুখে জামাতার নিরুদ্দেশের কথা বলিতে শুনিয়া, একটু কাঁদিয়া ফেলিলেন।

---

(৪)

এই সময়ে, অকস্মাৎ আর এক সন্ন্যাসী সেইখানে উপস্থিত হইলেন। পরিধানে গৈরিক বসন, দেহ বিভূতিপরিলেপিত, শিরে জটাজুট পরিব্যাপ্ত। আকৃতি গম্ভীর অথচ প্রশান্ত; মুখমণ্ডলও প্রফুল্ল, কিন্তু ললাটদেশ ঈষৎ চিন্তারেখা বিশিষ্ট। বর্ণ তপ্তকাঞ্চনবৎ, দেহ বলিষ্ঠ, বয়স প্রায় চল্লিশ। নবাগত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে চাহিয়া রহিল। কেহ কেহ বা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী, তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন, "আপনারা আমাকে প্রণাম করিবেন না;—প্রণাম করিলে আপনাদের অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে।"

পরে মহান্ত-বাবাজীকে কহিলেন, "মার্কণ্ড! এই বুঝি তোমার শিব-পূজা হ'চ্ছে?"

কথাটা, মার্কণ্ড বাবাজীর মনঃপূত হইল না,—তাই তিনি মনে মনে কি-একটু ইংরাজী আওড়াইলেন!

নবাগত সন্ন্যাসী, স্ত্রীলোকগণকে কহিলেন, "আপনাদের কাজ হ'য়ে গেছে, এখন বাড়ী যেতে পারেন।"

জনৈক প্রবীণা কহিলেন, "হাঁ, আমাদের হাত-দেখান হ'য়ে গেছে বটে, তবে এই মেয়েটির বিষয়ে, এর দিদী-মা কিছু জান্‌তে চান।"

"তা বেশ ;—আমিই এই মেয়েটির হাত দেখ্‌চি। কিন্তু আর কেউ কাছে থাক্‌লে কিছু বল্‌তে পার্‌ব না ; আর ব'ল্লেও সব কথা ফল্‌বে না !"

"তা আমরা নয় যাচ্চি। আপনি দয়া ক'রে ব'লে দিন,—এর বাপ এখন কোথায়, আর কি হালে আছে? আহা, সোয়ামীর ভাবনায় এর মা হতভাগিনী, আজ ক' বছর অবধি মরার-মত হ'য়ে প'ড়ে আছে !"

সন্ন্যাসী একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন। কহিলেন, "আমার যথাসাধ্য গণনা ক'রে দেখি, যা হয় পরে শুন্‌তে পাবেন ; কিন্তু এখন আপনারা আসুন, কেবল এই মেয়েটি থাক্।"

এ কথায় পাঁচজনে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। রামের-মা কহিল, "তা হোগ ব্যানে সন্ন্যাসী,—তা' ব'লে মেয়েটাকে ফেলে রেখে যেও না ! কে, কোন্ ছলে, কি কর্‌তে এসেছে, তার ঠিক কি ?"

বিচক্ষণ রামের-মার কথাটা সকলের মনে ধরিল। সকলেই একমত হইল। সন্ন্যাসী তাহা বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, অগ্রে ইহাঁদের সংশয় দূর না করিলে, অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। তিনি কহিলেন, "আপনাদের পুরুত-ঠাকুর ত এখানে রহিলেন, এঁর সঙ্গে এখনই মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ইচ্ছা করেন ত, আপনারাও থাক্‌তে পারেন, কিন্তু তাতে গণনাটি না মিল্‌তেও পারে।"

এ কথায় অগত্যা আবার সেই বিচক্ষণ রামের-মা উপদেশ দিলেন, "তাও বটে। তবে লীলা থাকে থাক্। পুরুত-ঠাকুর ত, আমাদের আর পর নন। আর আমাদের ঘর-বাড়ীও ত ঐ দেখা যাচ্ছে। ভাল, দেখাই যাক না,—ইনি শুণে কি বলেন? কি বল গো, শান্তর-মা?"

কিন্তু শান্তর-মার দৃষ্টি তখন সেই সন্ন্যাসীর উপরেই ন্যস্ত ছিল,—এ সকল কথা তাঁহার কাণে প্রবেশ করিয়াছে কি না, সন্দেহ। অনিমেষ নয়নে সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া আছেন, ও মনে মনে কি ভাবিতেছেন। তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল; কিন্তু মুখ ফুটিয়া তিনি একটি কথাও কহিতে পারিলেন না।

বলিতে হইবে না যে, লীলার মার নাম শান্ত।

রামের-মা এবার সকল কথা বুঝাইয়া বলিলে, তিনি শুনিলেন। সুতরাং রামের মার কথাই সাব্যস্ত হইল। অতঃপর সকলে শিব-প্রণামাদি করিয়া, পুরুতঠাকুরকে বলিয়া গেলেন যে, লীলা, সন্ন্যাসীর কাছে রহিল, হাত-দেখা হইয়া গেলে, পুরুত-ঠাকুরই লীলাকে বাড়ী পঁহুছিয়া দিবেন।

পুরুত-ঠাকুর দু' পয়সা পাইয়াছেন, সুতরাং খুসী আছেন। তিনি মাথা নাড়িতে নাড়িতে সাহ্লাদে কহিলেন, "তা, এ কাজটা আর পার্‌ব না? তবে আর আপনাদের 'আপনার জন' কি? তা' মায়েরা মাঝে মাঝে বাবার মন্দিরে আস্‌বেন। এখানে এলেও পুণ্যি আছে;—এমন কত সাধু-সন্নিসী নিত্যি বাবাকে দেখ্‌তে আসেন।"

স্ত্রীলোকদল সারি গাঁথিয়া নানা কথা কহিতে কহিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন। কেবল শান্তর-মা, মাঝে মাঝে এক একবার

পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখেন ও অঞ্চল দ্বারা দুই এক ফোঁটা চক্ষের জল মুছিতে থাকেন। কি ভাবিয়া তিনি মনে মনে কহিলেন, "বাবা অমরকনাথ কি তাই কর্‌বেন? শান্তর-আমার কি আবার সুদিন আস্‌বে?

---

(৫)

লীলা, এতক্ষণ তাহার সেই ডাগর চক্ষু দুটি মেলিয়া, এক-দৃষ্টে সন্ন্যাসীকে দেখিতেছিল;—যেন কতদিনের পরিচিত—কে আপনার-হইতেও-আপনার-জন সে পাইয়াছে;—তাই আর সকলে বাড়া গেল দেখিয়াও, সে কাঁদিল না, বা কোন 'বায়না' লইল না। সন্ন্যাসীও নির্নিমেষ নয়নে বালিকার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সে চক্ষের পলক আর পড়ে না।

লীলা, দেখিতে বড় সুন্দর। চাঁদপানা মুখ, সুকুমার অঙ্গ-সৌষ্ঠব। বালিকার রূপে যেন বৃক্ষতল আলো করিয়াছে। নিবিড় মেঘবর্ণ কুঞ্চিত অলকাগুচ্ছ, লীলার সেই নির্ম্মল মুখখানি ঈষৎ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নীরবে, বালিকাকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল; অমনি সেই বিভূতিপরিশোভিত গণ্ডস্থল বহিয়া, টস টস করিয়া দুই ফোঁটা গরম জল বালিকার হাতের উপর পড়িল।

এবার বালিকা কথা কহিল। মধুমাখা আধ আধ স্বরে বলিল, "তুমি কাঁদ্‌চ কেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর?"

সন্ন্যাসী, লীলাকে কোলে লইলেন। মুখচুম্বন করিয়া কহি-

লেন, "না মা, আমি কাঁদি নে। তোমার নামটি কি, বল দেখি মা ?"

বালিকা এবার কোন কথা কহিল না, তাহার লজ্জা হইল। ডাগর চক্ষু দুটি এবার ভূমিপানে ন্যস্ত করিল। সন্ন্যাসী আবার কহিলেন, "তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে। তোমার মুখখানি বড় সুন্দর। তোমার নাম সুন্দরী, না মা ?"

বালিকা এবার হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে সুধার লহরী ছুটিল। তার নাম ত সুন্দরী নয়,—তাই এ হাসি। সেইরূপ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমার নাম কিছু সুন্দরী নয়,—আমার নাম লীলা!"

"লীলা! বাঃ, দিব্বি নামটি ত! আচ্ছা মা, তোমার এই নামটি কে রাখলে, বল ত!

"কেন,—আমার মা!"

সন্ন্যাসী একটি নিশ্বাস ফেলিয়া একটু চুপে চুপে কহিলেন, তোমার মার নাম কি, মা ?"

"বল্‌বো কেন ?—কৈ সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি আমার হাত দেখলে না ?"

"হাঁ মা, এই দেখ্‌চি। তুমি একটা আঁব খাবে, মা ?"

"না,—মা বক্‌বেন।"

"বক্‌বেন কেন ? তোমার বাবা কোথায় ?"

"বাবা ?—আবার বাবা নেই। মা আছেন, কিন্তু বুঝি তিনিও আর থাকেন না!"

সন্ন্যাসী আবার একটি নিশ্বাস ফেলিলেন। কহিলেন, "কেন ?"

"বাবার জন্যে কেঁদে কেঁদে তাঁর চোক গেছে।—মা আমার সময়ে খান না, সময়ে ঘুমোন না,—কেবলই বাবার জন্যে কাঁদ্‌তে থাকেন! আচ্ছা সন্ন্যাসী-ঠাকুর! আমার বাবা কোথায়, জান?"

"না!—তোমার বাবাকে তুমি দেখেছ?"

আধ-আধ মধুমাখা-স্বরে বালিকা উত্তর করিল, "না।—আমি তখন ছেলে-মানুষ ছিলুম, কিনা, তাই দেখি নে। একদিন ঘোষেদের কাকাবাবুর কোলে উঠেছিলুম, তা' তাঁর বিজয় বড় রাগ ক'লে;—ব'ল্লে, 'আমার বাবার কোলে তুই উঠবি কেন?' তা আমি নেবে বল্লুম, 'আচ্ছা, আমিও একদিন আমার বাবার কোলে উঠ্‌বো।' দিদিমাকে ব'ল্লে তিনিও ঐ কথা ব'ল্লেন। বল্লেন, বাবা নাকি আমার জন্যে খাবার আন্‌তে গেছেন। তা আমার আর খাবারে কাজ নি, আমি বাবার কাছে যাব;—আমার বাবাকে দেখতে বড় সাধ যায়। মাকে, বাবার কথা জিজ্ঞাসা ক'ল্লেই মা কাঁদতে থাকেন। আর বলেন, তিনি ঐ আকাশে আছেন! তা' ও বড় উঁচু, আমি উঠ্‌তে পার্‌ব কেন?"

সন্ন্যাসীর চক্ষু হইতে আবার টস্‌টস্‌ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল পড়িল। একটি নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, "তা' তুমি তোমার বাবাকে ডাক না কেন?"

"আমি কতবার ডেকেছি, বাবা ত' আসেন না! এই দেখ সন্নিসি-ঠাকুর,—এই সক্কলেরই বাবা আছে;—তাদের বাবা তাদের কত যত্ন করে, আদর করে, আর আমার বাবা নেই! এ কথা ভাব্‌লে আমার বড় কান্না পায়। কতদিন সক্কলের আড়ালে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঐ আকাশের পানে চেয়েছি, আর

মনে মনে বাবাকে ডেকেছি।—তা' বাবা আমার এমনি দয়া-মায়া হীন যে, আমায় দেখা দেন না।"

সন্ন্যাসীর চক্ষু হইতে আবার টস্ টস্ করিয়া জল পড়িল। পরে, তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বালিকার হাতখানি ধরিয়া কহিলেন, "দেখি মা, তোমার হাতখানা?"

এবার বালিকা হাসিয়া কহিল, "আমি বুঝি তোমার মা! তুমি অত বড় ছেলে,—আমি কি তোমার মা হতে পারি? আহা, তোমার বুঝি মা নেই?"

"এই যে তুমি আমার মা! আমি তোমার ছেলে!"

সন্ন্যাসী আবার একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, ঈষৎ স্মিতমুখে কহিলেন, "তুমি যদি আমার মা না হও, তা' হ'লে তোমার বাবা কোথায়, বল্‌ব না।"

বালিকা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "আচ্ছা, আমি যেন তোমার মা হলুম।—এখন বাবা কোথায়, বল!"

মনে মনে লীলার বড় লজ্জা হইল। অত বড় বুড়ো ছেলের সে মা! তবু আবার সেই ডাগর চক্ষু দুটি মেলিয়া কহিল, "বাবা কোথায়?"

সন্ন্যাসী আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না;—সেই কুসুম-কমনীয় বালিকার মুখচুম্বন করিয়া, গদ্গদস্বরে কহিলেন, "মা, আমিই তোমার সেই হতভাগ্য পিতা! চল মা, ঘরে যাই।"

সন্ন্যাসীর চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল।

---

(৬)

মহান্ত-বাবাজী এতক্ষণ নির্ব্বাক্ অবস্থায় ছিলেন, এইবার কহিলেন, "প্রভু, এই কি আপনার কন্যা?"

শরচ্চন্দ্র তখন আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। কহিলেন, "বৃথায় এতদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। আমার সোণার সংসার ভাসাইয়া দিয়া, আমি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়াছি। শম্ভু, তুমিও গৃহে যাও। মিথ্যা, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের সঞ্চয় করিও না। তুমি আমাকে গুরু ধরিয়াছিলে,—আমিই তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি পুনরায় গৃহী হও। মায়া ত্যাগ, কাহারও ইচ্ছাধীন নয়। আর মায়া-পাশ না কাটিয়া সন্ন্যাসী সাজা, সং-সাজা মাত্র!"

পুরুত-ঠাকুর, আশপাশেই ছিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই এ সুখের সংবাদ শুনিলেন। আহ্লাদে ডগমগ হইয়া, আজ বিলক্ষণ দু' পয়সা লাভ হইবে বুঝিয়া, তিনি শরচ্চন্দ্রের সঙ্গ লইলেন। আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন, "মুখুয্যে মশাই, আমাকে চিন্‌তে পারেন কি? আমি তোমার সেই কেষ্ট খুড়োর ছেলে! লেখাপড়া কিছু শিখি নে, পাড়ার পাঁচ জনের কৃপায় আর তোমার বাপ মার আশীর্ব্বাদে বাবার ঘণ্টা নেড়ে দু'মুঠো খাই! চলুন, ঘরে চলুন। আপনি নিরুদ্দেশ হওয়া অবধি আপনার পরিবার মরার-মত হ'য়ে আছেন। আহা! সতী-সাবিত্রীকে দেখা দিন। ভাগ্যে আজ আপনার শাশুড়ী-ঠাকুরণ নাতিনীটিকে নিয়ে বাবার মন্দিরে এসেছিলেন! তা না হ'বে কেন, না হ'বে কেন,—বাবার মাহাত্ম্যে কি না হ'তে পারে! আহা, যদি আমার সেই হতভাগা

ভাইটাকে আপনার মত গৃহী দেখ্‌তে পেতুম! শম্বো ছোঁড়ার শোকে, মা-আমার ম'রে আছেন ব'ল্লে হয়!"

বাবাজী শম্ভু আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না,—আউ মাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "দাদা, আমিই তোমার সেই হতচ্ছোড়া ভাই! পেটের দায়ে এতদিন মার্কণ্ড মোহন্ত সেজে বেড়াচ্ছিলুম!"

পুরুত-ঠাকুর ও মার্কণ্ড-বেশী শম্ভু পরস্পরে আলিঙ্গন করিল ও গৃহে গেল।

লীলা, এই সব ভাবগতিক দেখিয়া ত এতক্ষণ অবাক্! তার চোকে জল, মুখে হাসি। সে শোভা বড় সুন্দর।

বালিকা হাসি-কাদমুখে সন্ন্যাসীকে কহিল, "বাবা! সত্যি তুমি আবার বাবা? তবে চল মার কাছে যাই।"

"চল মা যাই।"

এই বলিয়া, সেই কুসুমকোমলা, প্রাণময়া, সৌন্দর্য্য-প্রতিমাকে কোলে লইয়া সন্ন্যাসী গৃহাভিমুখে চলিলেন।

---

(৭)

অল্পক্ষণের মধ্যেই শরচ্চন্দ্র গৃহে পঁহুছিলেন। পতিব্রতা শান্ত তখন প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিলেন। তাঁহার বাম অঙ্গ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছিল। স্বামীকে দেখিবামাত্র তিনি চিনিলেন। ছুটিয়া গিয়া সতী, স্বামীর পদপ্রান্তে লুটিয়া পড়িলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "প্রভু, দাসীকে ফেলিয়া এতদিন কোথায় ছিলে?"

মুখ ফুটিয়া সকল কথা বাহির হইল না। সতী, শতধারে স্বামীর পাদমূল সিক্ত করিতে লাগিলেন।

লীলা পিতার ক্রোড় হইতে নামিয়া, ছুটিয়া গিয়া মাতামহীকে এ সুখের সংবাদ দিল।

শরচ্চন্দ্র, কম্পিত কলেবরে, সহধর্ম্মিণীর হাত ধরিয়া কহিলেন,"উঠ উঠ, গৃহলক্ষ্মি-আমার! আবার তোমাকে লইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিতে আসিয়াছি। প্রাণাধিকে, স্বামীর শত অপরাধ বিস্মৃত হও!"

মুহূর্ত্ত মধ্যে শুভসংবাদ সকলের কর্ণগোচর হইল। সকলে তথায় উপস্থিত হইল। লীলা, মাতামহীর হাত ধরিয়া সেখানে আসিল। মাতামহী, কাঁদিতে কাদিতে জামাতা-কন্যাকে গৃহে তুলিলেন। সে গৃহে-তোলার-আনন্দ, তিনিই বুঝিলেন।

লীলা, তার কচি হাতখানি মায়ের মুখে বুলাইয়া, মধুমাখা আধস্বরে কহিল, "আর কাঁদ কেন মা? বাবাকে ত ধ'রে এনেছি!"

শান্ত, কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "মা, তোমার শতবর্ষ পরমায়ু হোক!"

সমাপ্ত।

প্রায়শ্চিত্ত।

(১)

নারায়ণপুরে এক-ঘর বড় জমিদারের বাস। জমিদারের নাম—প্রতাপনারায়ণ রায়। প্রতাপনারায়ণের প্রতাপ অতি প্রবল। তাঁহার নাম-ডাকে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খায়। প্রতাপনারায়ণের প্রকৃত জাতি বা বংশ-বিবরণ নির্ণয় করা কঠিন। 'রায়' উপাধিতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলি প্রভৃতি অনেক জাতি বুঝায়। প্রতাপনারায়ণ, সমাজে আপনাকে কায়স্থকুলতিলক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু গ্রামের দুষ্ট লোকে তাঁহার জাতি লইয়া কানাকাণি করে। পয়সার জোরে কেহ তাঁহার জাতি মারিতে বা তাঁহাকে একঘ'রে করিতে না পারিলেও, প্রকৃত ভদ্রলোকে তাঁহাকে লইয়া পানাহার করেন না, কিংবা কোন ঘরণা-ঘরে এ অবধি তাঁহার কোন বৈবাহিক আদান-প্রদানও হয় নাই।

প্রতাপনারায়ণের কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু অসুবিধা ঘটে নাই,—যেহেতু তিনি এক পুরুষে 'নগ্‌দা' বড়লোক। দুনিয়াকে তিনি দৃক্‌পাতও করেন না। তা' না করুন,—তাহাতে দুনিয়ার কিছু যাইতেছে-আসিতেছে না,—মোদ্দা কথা, নারায়ণপুরের ভদ্র গৃহস্থ-পরিবারদিগের সুখ-শান্তিতে বাস করা এক রূপ

দায়'হইয়া উঠিয়াছে। এমন অর্থলোলুপ, পরশ্রীকাতর, দারুণ দুষ্মন আর গুটিকতক থাকিলেই, এইখানে—এই মনুষ্যসমাজেই "নরক গুল্‌জার" হইত। সৌভাগ্যবশতঃ, নারায়ণপুরের ভদ্রলোক মাত্রেই রায় মহাশয়ের উপর হাড়ে হাড়ে চটা। স্বার্থের খাতিরে, রায় মহাশয় না পারেন, এমন কাজই নাই; সুতরাং প্রায় সকলকেই অল্প-বিস্তার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, রায় মহাশয়ের সহিত মৌখিক সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতে হইত।

এই জমিদার-রূপী জীবটীর বিশেষ 'টাঁশ্'টা—পরের জমি-জমার উপর। কাহারও একটু ভাল বাগান-বাগিচা বা দু' কাঠা জমি-জিরাং দেখিলেই তাঁহার চক্ষু টাটায়। ছলে, বলে, কৌশলে, যেরূপেই হউক, সেটুকুর দখলিকার হইতে না পারিলে তাঁহার আর স্বস্তি নাই। ইহাতে জাল-জালিয়াতি, ঘুষ-মিথ্যাসাক্ষ্য, প্রলোভন ভয়-প্রদর্শন—যত রকম উপায় থাকিতে পারে, তাহা করিতে তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহেন। কূটবুদ্ধি উদ্ভাবনে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। যে কাজটা দশ বৎসর পরে সমাধা হইবে, রায় মহাশয় দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাহার "আট-ঘাট" বাঁধিয়া রাখেন, হরেক রকমের "ফন্দি" উদ্ভাবন করিতে থাকেন। ঠিক্ যেন ব'ড়ের চাল। যে কিস্তীতে 'মাৎ' করিতে হইবে, তোখড় খেলোয়াড় রায় মহাশয়, ঠিক্ সেই ক'টি ঘুঁটীর উপর সঘন দৃষ্টি রাখেন। ভাল 'চার' দিলেই, তখনই হউক আর দু'দণ্ড পরেই হউক, মাছ আসিবেই। ধৈর্য্যশীল তোখড় মেছুড়ে ভিন্ন সংসার পুকুরে মাছ-ধরা যে-সে 'আনাড়ী'র কাজ নয়। রায় মহাশয় ইহা বুঝিতেন। বুঝিতেন যে, যাহার বুকের রক্ত চুষিয়া খাইতে হইবে, কি যাহার দেহ হইতে এক বুরুল মাংস

কাটিয়া লইতে হইবে, তার দুটো কড়া কথা, কিংবা মাথা-মুড় খোঁড়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া নিষ্পন্দ, নিশ্চল, নির্ব্বাক্ পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্থির থাকিতে হইবে। এই 'চাণক্য-নীতিই' তাঁহার মূল মন্ত্র। তাঁর অনুচর-পার্শ্বচরগণকেও সর্ব্বদাই তিনি এই নীতি শিক্ষা দেন। অনুচর পার্শ্বচরগণ দুরদৃষ্টক্রমে, গুরুর নীতির এই গভীরত্ব সব সময়ে তলাইয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। জমিদার রূপী জীবটি এমনই অদ্ভুত ধাতুতে গঠিত।

---

(২)

এই গ্রামে একঘর মধ্যবিৎ ব্রাহ্মণ বাস করেন। ব্রাহ্মণের নাম—রামরূপ ঘোষাল। ঘোষাল মহাশয়ের কিছু জমি আছে। জমিগুলি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর। রায় মহাশয়ের অনেক দিন হইতে এই জমি গুলির উপর 'টাক' আছে। তলে তলে তিনি অনেক 'অন্দি ফন্দি'ও যোগাড় করিয়া রাখিয়াছেন,—একটু কিছু 'অছিলা' পাইলেই আত্মসাৎ করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু সুবিধা ঘটিয়া উঠিতেছে না। প্রথমে অর্থ প্রলোভন,—দশ টাকার জায়গায় বিশ টাকা দর দিয়া খরিদের চেষ্টা;—তাহাতে কিছু ফল হইল না বুঝিয়া, খামকা নিজের ও ঘোষালের দুই মাতব্বর প্রজার মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া একটা মোকদ্দমা খাড়া করিলেন। কিছুদিন ধরিয়া উভয় পক্ষে কিছু অর্থের শ্রাদ্ধ হইল। শেষে ঘোষাল মহাশয়ের প্রজা জয়লাভ করিল। সাধারণ্যে—আদালতে প্রকাশ পাইল যে, রায় মহাশয়ই সকল অনর্থের মূল। তাঁহারই শিক্ষামত এই মিথ্যা মামলা উপস্থিত হইয়াছিল। আদা-

লত-শুদ্ধ সকলেই রায় মহাশয়কে "ছিঃ ছিঃ" করিতে লাগিল। প্রজাকে এই বিপদ্-জাল হইতে উদ্ধার করিতে ঘোষাল মহাশয়েরও অনেক টাকা খরচ হইল। ব্রাহ্মণ, দুর্দ্দান্ত জমিদারকে উদ্দেশ করিয়া, আদালতে—সর্ব্বসমক্ষেই কহিলেন, "রায় মহাশয়! থামকা এ রকম ক'রে এক জনকে 'হায়রান্' করেন কেন? সোজা কথায় ব'ল্লেই ত হত,—'ঘোষাল! তোমার অমুক জমিটা আমায় ছেড়ে দাও,' মিথ্যা মিথ্যা একটা লোককে মজাইতে যান কেন? পরকাল আছে,—মরিতে হইবে, এ কথাটা যেন মনে থাকে!"

এইরূপ কিছু মিঠে-কড়া রকমের দুই চারি কথা শুনাইয়া, ব্রাহ্মণ আপন গ্রহ আপনি আনয়ন করিলেন। এই হইতেই ঘোষাল মহাশয়ের উপর জমিদারের বিষদৃষ্টি পড়িল। কিসে ব্রাহ্মণকে উদ্বাস্ত করিয়া ব্রাহ্মণের 'ভিটে-মাটী-চাটী' করিবে, কিসে ঘোষালকে ধনে-প্রাণে মজাইয়া, তাঁহার যথা-সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবে, নিষ্ঠুর রায়-জমিদারের এখন তাহাই ধ্যান-জ্ঞান হইল।

---

(৩)

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই, আর একটা মুসলমান প্রজার সহিত চক্রান্ত করিয়া, প্রতাপনারায়ণ আর এক চাল চালিল। ঘোষাল ব্রাহ্মণের প্রতি এবারকার অভিযোগ বড় গুরুতর। তিনি নাকি তাঁহার লোকজন লইয়া রাতারাতি একটা জায়গা দখল করিবার উদ্দেশ্যে, অমুক মুসলমানের ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছেন,

আর আপন দখলি-স্বত্ব প্রমাণের জন্য, সেই রাত্রেই নাকি এক ঘর খাড়া করিয়াছেন। সাক্ষী সাবুদ, দলিল দস্তাবেজ—কোন বিষয়ের কোন ত্রুটীই প্রতাপনারায়ণ রাখিল না। দেখিতে দেখিতে মোকদ্দমা 'সঙ্গীন' হইয়া উঠিল। প্রতাপ, এবার অর্থের বিষয়ে মুক্তহস্ত হইয়াছে। জেলার কৌন্সলী উকিল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র মোক্তারটি পর্য্যন্ত হস্তগত করিয়াছে। কাহাকেও নিযুক্ত করিয়াছে, কাহাকেও বা 'বায়না পত্র' দিয়া রাখিয়াছে।

ঘোষাল ঠাকুর অকূল পাথারে পড়িলেন, চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। প্রতাপ—ধনকুবের, অর্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, ইহা বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, এখন একমাত্র ধর্ম্মই তাঁহার সম্বল। অন্তরে দুর্গানাম জপ করিয়া, ব্রাহ্মণ আকাশপানে চাহিয়া কহিলেন, "মা সর্ব্ব-মঙ্গলে! কূল দিস্ মা!"

যথাকালে মোকদ্দমা উঠিল। আদালত লোকে লোকারণ্য। বাদী—সেই মুসলমান প্রজা, প্রতিবাদী—ঘোষাল ব্রাহ্মণ। মুসলমান প্রজা নাম মাত্র বাদী,—সর্ব্বেসর্ব্বা হইতেছে—দুর্দ্দান্ত প্রতাপনারায়ণ। প্রতাপনারায়ণ যেরূপ কলকাটী নাড়িতেছে, মামলার গতি সেই দিকে ফিরিতেছে। কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে! মামলার ভাব-গতিকে আর প্রতাপনারায়ণ নামক স্বনামধন্য জীবটির সুনামের পরিচয়ে, জজসাহেব পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ সন্দিহান হইয়াছিলেন। প্রতিবাদীর পক্ষে উকিল-কৌন্সলী জনপ্রাণী নাই দেখিয়া, বিচারক বাহাদুরের পূর্ব্ব-সন্দেহ আরও প্রবল হইল। তিনি যতদূর পারিলেন, আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, অতি ধীরভাবে, বিচক্ষণতার সহিত বিচার কার্য্য-করিতে

লাগিলেন। মোকদ্দমা একাধিক্রমে সাতদিন চলিল। ধর্ম্মের কেমন মহিমা!—শেষে সেই অশিক্ষিত আনাড়ী বাদী মুসলমান, সামান্য একটা জেরার ফেরে মাম্‌লাটা একেবারে মাটী করিল! প্রতিবাদী এককালে অব্যাহতি পাইল। ধর্ম্মের কলে উল্‌টা চাপ পড়িল;—মিথ্যা মোকদ্দমা আনয়ন জন্য, বাদী মুসলমানের সশ্রম এক বৎসর কারাদণ্ড হইল।

---

(৪)

অর্থনাশ, মনস্তাপ, অপমান, নির্য্যাতনে ক্রূর প্রকৃতি প্রতাপনারায়ণের প্রকৃতি আরও ভীষণ—ভয়াবহ হইয়া উঠিল। পাষণ্ড, এই বার ব্রাহ্মণ রামরূপের প্রাণ লইতে সঙ্কল্প করিল।

রামরূপ অতি নিরীহপ্রকৃতি, নিষ্ঠাপরায়ণ ও ধার্ম্মিক। জমিদার কর্তৃক বার বার এইরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিয়া, তিনি এক একবার গ্রাম পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু মমতাবশতঃ তাহা পারিয়া উঠিতেছেন না।

প্রতাপের চর চারিদিকে। এক দিন ওরিমধ্যে একটু ভদ্র চর, রামরূপকে হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিল, "ঘোষাল মহাশয়! এ আপনার কিরূপ বুদ্ধি! কুমীরের সহিত বিবাদ করিয়া জলে বাস করা শোভা পায় না। আপনার যদি ভালর ইচ্ছা থাকে, তবে জমিদর বাবুর শরণাপন্ন হউন। বার বার যে, সকল মোকদ্দমাতেই জয়লাভ করিবেন, এমন কিছু কথা নাই।"

ব্রাহ্মণ একটী নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তুমি যাহা

বলিতেছ, কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু ভাই, বল দেখি, সাধ্য সত্ত্বে; কে আপন বিষয় পরকে দেয়? ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, বাগানের ফল মূল—আমার এ সোণার বিষয়,—আজ সাত পুরুষ ভোগ করিয়া আসিতেছি,—হঠাৎ ছাড়িতে মমতা হয় না কি? আর ঐ মামলা-মোকদ্দমার কথা যাহা বলিলে, তাহা আমিও বুঝি। আমিও বুঝি যে, আইনের চক্ষে ধূলি দেওয়া বড় বেশী কথা নয়! কিন্তু ভাই, উপরে একজন আইন-ওয়ালা আছে, তার চক্ষে ধূলি দেওয়া ত কারও সাধ্যায়ত্ত নয়! আমার সেই আইন-ওয়ালাই ভরসা।"

ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে মনকেও এইরূপে প্রবোধ দেন।

এদিকে সেই মুসলমান-প্রজার কারদণ্ড হওয়া অবধি প্রতাপ এক দিনের জন্যও সুস্থির নহে। অর্থনাশ, মমস্তাপ ত আছেই,—তার উপর দেশ যুড়িয়া তাহার একটা মস্ত কলঙ্ক রটিল। বেকার বওয়াটে বালকদল নাম ভাঁড়াইয়া, জমিদারের নামে নানা কুৎসিত রচনা গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই সব পয়ার-গানে রায়-জমিদারের বংশাবলীতেও টান পড়িল। ছাপার আখরে, কখন বা হস্তাক্ষরে সেই সব পয়ার যত্র-তত্র বিরাজ করিতে লাগিল।

পাড়ার অনাহুত-সমিতি অমনি যেখানে সেখানে বৈঠক বানাইয়া, অথচ ভিতরে ভিতরে একটু মজা দেখিয়া, সেই সকল পয়ার-গানের প্রতিবাদে তৎপর হইলেন;—"তাই ত, এ বড় অন্যায় কথা,—এর প্রতিকার হওয়া উচিত" ইত্যাকার ভূমিকা ফাঁদিয়া, তাঁহারা জমিদার-প্রভুর অনুগ্রহলাভের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন এবং সাধ্যমতে আপন আপন 'সতীপনার'

পরিচয় দিতে লাগিলেন। অর্থাৎ তাঁরা যে এর মধ্যে নন, সেই কথাটা প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান হইলেন।

এ যত কিছু অনর্থ, যত কিছু বেয়াদবি—এ সকলেরই মূল—রামরূপ ঘোষাল, প্রতাপনারায়ণ এইরূপ বুঝিল। বুঝিল যে, সেই বিটলে বামন হইতেই তার ইজ্জতের উপরেও টান পড়িয়াছে! পাপিষ্ঠ, সেই নিরীহ রামরূপের উপর দিয়াই সকল রাগ তুলিতে সঙ্কল্প করিল।

---

(৫)

আজ কয়দিন অবধি প্রতাপের জন কত চর, রামরূপের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ব্রাহ্মণ কখন্ কোথায় যায়, কখন কি করে,—তন্ন তন্ন করিয়া তাহার অনুসন্ধান লইতেছে। আর মামলা মোকদ্দমায় জেরবার না করিয়া—ততদিনও ধৈর্য্য না থাকায়, পাপিষ্ঠ প্রতাপ, ব্রাহ্মণকে 'গুম-খুন' করিয়া ইহজগৎ হইতে অন্তর্হিত করিতে সঙ্কল্প করিল।

রামরূপ নিজেই আপনার জমি-জমা দেখিতেন, আদায়-উসুলও নিজে করিতেন। কেবলমাত্র একটি কৈবর্ত্ত মুহুরি ছিল। মুহুরিটিও মধ্যে মধ্যে মনিবের সহিত খাজনা-পত্র আদায় করিতে যাইত। নারায়ণপুর হইতে তিন মাইল পথ ব্যবধানে গোপালপুর নামে একটি পল্লী আছে। তথায়, কয়েক ঘর মাত্র কৃষিজীবী প্রজা বাস করিয়া থাকে। নারায়ণপুর হইতে গোপাল-পুর যাতায়াত করিতে স্বতন্ত্র পথ নাই,—একটা বড় মাঠ পার হইয়া যাইতে হয়।

ঘোষাল ব্রাহ্মণ আজ অপরাহ্ণে সেই মুহুরিটিকে লইয়া, গোপালপুরে কিছু খাজনা সাধিতে গিয়াছেন। প্রতাপের চর এ সন্ধান রাখিয়াছে। খাজনা-পত্র আদায়-উসুল করিয়া, উভয়ের বাড়ী ফিরিতে যে রাত্রি হইবে, চর এ খবরও লইয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া, আজ সে পিশাচ-প্রভুকে সংবাদ দিল। চর—মুসলমান।

---

(৬)

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অন্ধকার রাত্রি—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। পাপিষ্ঠ প্রতাপ একাকী এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া, কি ভাবিতেছে; এমন সময় সেই চর আসিয়া চুপি চুপি সংবাদ দিল,—"হুজুর! কম্ম শেষ কর্‌তে হয় ত, আজ করুন। এমন সুবিধে আর ঘট্‌বে না!

পাপিষ্ঠ প্রতাপের দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসাবৃত্তি হু হু জ্বলিয়া উঠিল। পিশাচ, ব্রাহ্মণকে স্বহস্তে বধ করিবে, সঙ্কল্প করিল এবং অনুচরকেও সেইরূপ কহিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া কহিল, "বেটার বুকের রক্ত চুষে খাব, তবে আমার নাম প্রতাপ রায়!—তবে আমি কট্‌কী কায়েত্‌!"

চর বিনীতভাবে উত্তর করিল, "হুজুর! এ নফরের, বিবেচনায় আপনার নিজের আর সে কাজটা ক'রে কাজ নেই। হুজুরের অনুমতি পেলে আমরাই সে কাজটা সাবাড় করি।"

প্রতাপ কি ভাবিল। বসিয়া ছিল, অস্থিরচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। স্থির-প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক মুষ্টি আরও দৃঢ় করিয়া, রুদ্ধ-

স্বরে কহিল, "ভাল, তাই হোক্। কিন্তু দেখিস, যেন শিকার হাত-ছাড়া না হয়। তা' হ'লে তোদেরও ধড়ে প্রাণ থাক্‌বে না।"

চর কহিল, "খোদার কিরে! হুজুর! জান্ থাক্‌তে শিকার ছাড়বো না।"

চরের নাম রহিমুদ্দীন। রহিমুদ্দীন আবার কহিল, "হুজুর! এখন আর বেশী কথা ক'বার সময় নেই। বকাউল্লা, নূরজান, করিমবক্স—তিন জনকে নিয়ে আমি এখনি চল্লুম। যখন হুজুরের মেহেরবাণী পেয়েছি, তখন এখনি সে দু' বেটারই মুণ্ড হাজির কচ্চি।"

প্রতাপ কহিল, "দেখিস, খুব সাবধান! যেন পশু পক্ষীতেও টের না পায়।"

পিশাচ-চর একটু বিকট হাসি হাসিয়া কহিল, "হুজুরের কৃপায়, ও ক'রে ক'রে আমরা পোক্ত হ'য়েচি, সেজন্য কিছু ভাব্‌বেন না। তবে আমাদের জলপানিটা"——

প্রতাপ কহিল, "আচ্ছা, যা' ব'লেছি, তার ডবল পাবি! এখন যা—কাজ শেষ ক'রে আয়।"

নরঘাতী অনুচর, পিশাচপ্রভুকে একটা সেলাম ঠুকিয়া, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। পাপিষ্ঠ প্রতাপও বিকটোল্লাসে একটা চীৎকার করিল।

---

(৭)

এদিকে রামরূপ ও তাঁহার মুহুরির, খাজনা-পত্র সাবিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। একজন প্রজা ঘোষাল মহাশয়কে

কহিল, “বাবা ঠাকুর! আজ এ রাত্রে আর আপনাদের বাড়ী গিয়ে কাজ নেই। আমার এখানে ‘পাকশাক’ ক’রে আজ রাত্রি কাটান, কাল ভোরের সময় এখান থেকে রওনা হ’বেন।” ঘোষাল মহাশয় কহিলেন, “না, রাত আর কতই বা হ’য়েছে! বাড়ী পৌঁছিতে নয় চার দণ্ড হোক! আমার বাড়ীতে কেউ নেই,—আমাকে যেতেই হ’বে। জানই ত, প্রতাপ-নারাণের সঙ্গে মনান্তর করা, আর কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ক’রে জলে বাস করা, একই কথা। কি জান, মুহুরীটি অবধি সঙ্গে এসেছে, বাড়ীতে আর কেউ নেই। গুণধর জমিদারের কল্যাণে কখন কি হয়, তা ত বলা যায় না!”

প্রজা। তা বটে। তবে আসুন, প্রাতঃপ্রণাম হই।

ঘোষাল মহাশয় শ্রীদুর্গানাম জপ করিয়া যাত্রা করিলেন। মুহুরীটি আলো ধরিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। তাহার এক হাতে একটি লণ্ঠন, আর এক হাতে মসী-শোভিত একটি দপ্তর। চতুর্দ্দশীর অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া বড় জোর দুই দণ্ড রাত্রি হইয়াছে,—এরি মধ্যে ঘোর অন্ধকার। সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে নিম্নে সর্ব্বত্রই অন্ধকার। সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে মুহুরির হাতে একটি মাত্র ক্ষীণালোক। পল্লীটির আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণ, মুহুরির সহিত মাঠে পঁহুছিলেন। মাঠে পঁহুছিয়াই উভয়ের হৃদয় একবার কাঁপিয়া উঠিল।

মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ, মুহুরির সহিত জমি-জমার কথা যুড়িয়া দিলেন। কথাবার্ত্তায় কিছু পথ নিরুদ্বেগে অতিক্রম করিলেন।

মুহুরির সহিত মাঠের মধ্যস্থানে আসিয়াছেন, এমন সময়ে মুহুরি তাহার সেই হস্তস্থিত ক্ষীণালোকে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল, একস্থানে কয় জন যমাকৃতি পুরুষ লগুড় হস্তে দাঁড়াইয়া পরস্পর কি বলাবলি করিতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ভয়ে তাহার পা আর উঠিল না,—সে, বিহ্বলচিত্তে প্রভুর পানে চাহিয়া রহিল।

ব্রাহ্মণ ঘোষালও স্তম্ভিতভাবে ইঙ্গিত করিলেন, "কি ?"

মুহুরি কোন উত্তর করিতে না পারিয়া অতি কষ্টে অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখাইল। ব্রাহ্মণ সে দৃশ্য দেখিয়া একটু সাহস বৃদ্ধির জন্য একবার গলা সাড়া দিলেন। কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন, "কে তোমরা ?"

ব্রাহ্মণের মুখে সকল কথা ফুটিতে-না-ফুটিতে সেই নরহন্তা মারকী চতুষ্টয় চকিতের ন্যায় তথায় আবির্ভূত হইয়া ভীমবেগে, উভয়ের মস্তকে লগুড় প্রহার করিল। "মাগো" বলিয়া মুহুরি ধরাশায়ী হইল। তাহার হস্তস্থিত সেই ক্ষীণালোকও নির্ব্বাণ হইল। "কে রে চণ্ডাল" বলিয়া ব্রাহ্মণও ভূপতিত হইলেন। অমনি উপর্য্যুপরি সেই আহত ব্যক্তিদ্বয়ের উপর প্রহার-বৃষ্টি হইতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে উভয়েরই প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

নরঘাতী পিশাচগণ কার্য্যোদ্ধার করিয়া দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমিষে কোথায় অন্তর্হিত হইল।

---

(৮)

সেই কাল-রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র নারায়ণপুরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গোপালপুরের মাঠে দুই ব্যক্তি খুন হইয়াছে,—মুহূর্ত্তের মধ্যে এ সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে আরও প্রকাশ পাইল যে, সে আহত ব্যক্তিদ্বয়—রামরূপ ঘোষাল ও তাঁহার মুহুরি!

ঘোষাল-পরিবারের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। পথে, ঘাটে সর্ব্বত্রই "লাল-পাগড়া" দেখা দিল। দারোগা, জমাদার ও কন্‌ষ্টেবল প্রভৃতি লোক জন চারিদিকে বিরাজ করিতে লাগিল, চারিদিকে 'হুরথাল' বসিয়া গেল। কত নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে অযথা 'হায়রান্' হইতে হইল। পুলিশ, যাহাকে 'দোষে' করিতেছে, তাহাকেই ধরিতেছে, বাঁধিতেছে, প্রহার করিতেছে। চারিদিকে এজাহারের ধূম পড়িয়া গেল।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল। খুনীর উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। শেষে খোদ মাজিষ্টর সাহেব আসিলেন, অনেক তদ্বির-তদন্ত করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চারিদিকে পুলিসের চর, (ডিটেক্‌টিভ) নিযুক্ত হইল। ডিটেক্‌টিভের দল বহুরূপী সাজিয়া নানা ছাঁদে—নানা ফাঁদে বেড়াইতে লাগিলেন। খোদ কোম্পানী হইতে 'খুনে' ধরিয়া দিবার পুরস্কার ঘোষিত হইল। কত লোকে কত-রকম-কি কাণাঘুষি করিতে লাগিল;—"তাই ত, এতদিন নয় ততদিন নয়—হঠাৎ রামরূপ ঘোষাল ও তার মুহুরীকে খুন করতে গেল কে? উঁহু! এ ঐ দারুণ দুঁদে প্রতাপ রায়ের কর্ম্ম!" প্রায় সকলেরই মনে এই

বিশ্বাস জন্মিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহ কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিল না। পাপিষ্ঠ প্রতাপও সেই খুনের দিন হইতে কেমন-এক-রকম হইয়া গেল। কাহারও সম্মুখে বড় একটা বাহির হয় না, কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কয় না, চোকো-চোকি দেখা হ'লেই চোক নামায়। দু'একটা কথা কহিতে গেলেও জীবের জড়তা প্রকাশ পায়। থাকিয়া থাকিয়া, চমকিয়া উঠে। পাপিষ্ঠ শিরঃপীড়ার অছিলা করিয়া, একেবারে শয্যাশায়ী হইল। অন্তঃপুরে স্নান, অন্তঃপুরে আহার, অন্তঃপুরেই সব!

পুলিশের মনেও সন্দেহ জন্মিল,—প্রতাপ রায় হইতেই এই নরহত্যা সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু কোনরূপ প্রমাণাভাবে, তাঁহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

---

(৯)

ঘোর মানসিক বিকারে দেখিতে দেখিতে পাপিষ্ঠ প্রতাপ শয্যাশায়ী হইল। চিকিৎসক আসিল, রীতিমত চিকিৎসাও চলিতে লাগিল; কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। পাপিষ্ঠ রহিয়া রহিয়া চমকিয়া উঠে ও বিকলকণ্ঠে চীৎকার করিতে থাকে। শেষ ঘোর উন্মাদ হইয়া উঠিল। চিকিৎসক, রোগ অতি সাংঘাতিক বুঝিয়া, বিদায় গ্রহণ করিল।

মহাপাপীর চক্ষে নিদ্রা নাই। সে, দিন রাত প্রলাপ বকে ও মাথামুড় খুঁড়িতে থাকে। সে প্রলাপের মর্ম্ম এই,—"ঐ ধরিতে আসিল, ঐ বাঁধিতে আসিল, ঐ মারিতে আসিল! ওরে,

আমায় ছেড়ে দে! দোহাই তোদের, আমায় খুন্ করিস্ নে! উঃ! নরহত্যা!—ভীষণ নরহত্যা! রামরূপ ঘোষাল! আমি আর তোমার জমি লইব না! আর তোমায় বিপদে ফেলিতে চেষ্টা করিব না! আমায় ক্ষমা কর!”

দিনের পর দিন গেল, মাস গেল; এক ঋতুর পর আর এক ঋতু যায় যায়, পাপিষ্ঠ প্রতাপের দারুণ ব্যাধির আর উপশম নাই,—রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

চিকিৎসকের পরামর্শে রোগীকে স্থানান্তরিত করা হইল। সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইতে লাগিল। সকল রকম চিকিৎসা চলিল,—মহাপাপীর এ যাত্রা আর পরিত্রাণ নাই।

---

(১০)

পশ্চিমাঞ্চলে, একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রতাপ আনীত হইয়াছে। পাপিষ্ঠের আত্মীয়-স্বজন সকলেই সঙ্গে আছে। একটি প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে।

এখানে আসিয়া পাপিষ্ঠের মস্তিষ্ক আরও বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইল। নিদ্রা ত হতভাগ্যকে এককালে ত্যাগ করিয়াছে;—যদি বা অতি অল্পক্ষণ মাত্র একটু তন্দ্রা আইসে, মহাপাপী তখনই আবার সেইরূপ প্রলাপ বকিতে থাকে। অধিকন্তু, সেই তন্দ্রাবস্থায় বিছানা হইতে উঠিয়া, ঘর ‘হাচাবাচা’ করিয়া বেড়ায়। যেন কোন অভীপ্সিত বস্তুর অনুসন্ধান করিতে থাকে,—তাহা আর মিলে না।

এইরূপ তন্দ্রাবস্থায়—যখন আর সকলে গভীর নিদ্রায়

অভিভূত,—পাপিষ্ঠ একদিন সকলের অজ্ঞাতে শয্যা হইতে উঠিয়া, মশারির সমস্ত দড়ী গুলি ছিঁড়িল। সেইরূপ অর্দ্ধ-জাগ্রত—অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায় সেই দড়ীগুলি উত্তমরূপে পাকাইয়া দৃঢ় করিল। মনে মনে কি ভাবিয়া, একটা ফাঁসি তৈয়ার করিল। পরে, বিকট হাস্যের সহিত, একটা বড় চৌকির উপর উঠিয়া, সেই ফাঁস, গৃহস্থিত একটা হুকে সংলগ্ন করিল। সে দিন অমাবস্যা,—ঘুট-ঘুটে অন্ধকার। সে ঘুট-ঘুটে অন্ধকারে কোলের মানুষও চেনা যায় না। বাহিরের অন্ধকার এরূপ ঘন, আর পাপিষ্ঠ প্রতাপের ভিতরের অন্ধকারও তদ্রূপ ভয়াবহ। সুরে সুর মিলিল।

পাপিষ্ঠ যেন তখন সহস্র কর্ণে শুনিতে পাইল,—"আত্মহত্যা"! সেই সূচীভেদ্য গভীর অন্ধকারে চারিদিক্ ভেদ করিয়া পাপিষ্ঠের কর্ণে বাজিতেছে,—"আত্মহত্যা"! সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, উর্দ্ধে নিম্নে—সর্ব্বত্রই যেন ধ্বনিত হইতেছে,—"আত্মহত্যা"! যেন কোন বিকট-দশন—অতি ভীষণ ভয়াবহ-মূর্ত্তি—এক হস্তে রজ্জু, অন্য হস্তে তীক্ষ্ণ তরবারী ধারণ করিয়া কহিতেছে,—"আয় আয় মহাপাপী, আমার কাছে আয়! নরহন্তা নারকীর প্রায়শ্চিত্ত এ পৃথিবীতে নাই! ঐ দেখ, মহানরক তোর সম্মুখে! আয় আয় পাপী, তোয় আমায় আলিঙ্গন করি!"

হোঃহোঃ বিকট-হাস্যে সেই নৈশ-প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মহাপাপী প্রতাপ সেই লম্বমান রজ্জু-ফাঁসিতে গলদেশ অর্পণ করিল। ঠিক সেই সময়ে যেন রামরূপ ঘোষালের প্রেতাত্মা তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিল, "প্রতাপ,

আত্মহত্যাই তোর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত! আশীর্ব্বাদ করি, "নরকেও যেন তোর্ স্থান না হয়!"

পাপিষ্ঠ প্রতাপও বিকটোল্লাসে, রজ্জুতে ঝুলিয়া পড়িয়া, পাদদেশস্থ কাষ্ঠাসন দূরে নিক্ষেপ করিল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল!

পরদিন প্রভাত-কিরণের সহিত সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, দারুণ মানসিক-বিকারে আত্মহত্যা করিয়া পাপিষ্ঠ প্রতাপ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে!

আজিকার দিনে এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে এরূপ প্রতাপ বিরল নয়,—প্রতাপের কাহিনী বড় গল্প নয়।

সমাপ্ত।

গণনা।

(১)

রামেশ্বর দত্ত কন্যাদায়ে বড়ই বিব্রত। আজকালের বাজারে, বার বছরের আইবুড় মেয়ে যে, কিরূপ গলগ্রহ, তাহা অনেকেই হাড়ে-হাড়ে বুঝিতেছেন। দত্তজ মহাশয়ও বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, শীঘ্রই মেয়ের বিয়ে না দিলে, তাঁহার আর কিছুতেই স্বস্তি নাই। বিশেষ, দত্তজের অবস্থা বড় মন্দ। দিন চলা ভার। এমন অবস্থায়, সৎপাত্রে কন্যাদান, বড় কঠিন কথা।

তবে একটুমাত্র সুবিধার কথা এই, মেয়েটি দেখিতে বড় সুন্দর। ফুট-ফুটে, টুক্‌টুকেটি। নলিনী ত নলিনীই বটে। মেয়েটি দেখিতে যেমন সুন্দর, গুণেও তেমনি সুন্দর। ঘরের কাজ-কর্ম্মে, লোকের সেবা শুশ্রূষায়, ছোট ভাই-বোনদের যত্ন-আদরে, নলিনী সকলেরই স্নেহের পাত্রী। এ ছাড়া, লেখা-পড়া ও সুকুমার কারু-কার্য্যেও তাহার অনুরাগ আছে।

কিন্তু হইলে কি হয়,—যেমন কাল, তেমনই ব্যবস্থা! আজকালকার লোকগুলা কেমন এক রকমেরই। উদ্বাহ-বন্ধনটা যেন একটা ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবলই টাকা—টাকা—টাকা! এই টাকার জোরে, এখন মৌলিক কুলীন হইতেছে; গণ্ডমূর্খও বিদ্বান-সমাজে স্থান পাইতেছে। দত্তজের পয়সা

নাই,—কিন্তু আর সকলই আছে। তিনি একজন ঘরণা-ঘরের ছেলে,—সভ্য, ভব্য ও শিক্ষিত। তবে বিধির বিপাকে পড়িয়া, এক্ষণে দারিদ্র্যের কণ্টকাকীর্ণ মুকুট মাথায় পরিয়াছেন! বিশেষ, মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া, দত্তজের আহার-নিদ্রা লোপ পাইয়াছে। শত স্থানে সম্বন্ধ হইল, শত স্থানেই তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। টাকাই ইহার মূলাধার। এইভাবে কিছুদিন গেল।

---

(২)

দত্তজের বড় ছেলেটির নাম প্রকাশ। প্রকাশ প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ অধ্যয়ন করিতেছে। প্রকাশ, ছেলেটি ভাল। লেখাপড়ায় খুব অনুরাগ আছে। কিসে পূর্ব্ব পুরুষদের কীর্ত্তি-কলাপ সজীব রাখিবে; কিসে বাপ-মায়ের দুঃখ ঘুচাইবে; কিসে দশের মধ্যে একজন হইবে,—এই সকল সদিচ্ছা, অনুক্ষণ তাহার অন্তরে জাগিত। এই সুবুদ্ধি বালকই দত্তজের এখন একমাত্র আশা-ভরসা-স্থল। প্রকাশের মুখখানি দেখিয়া, তিনি সকল কষ্ট সহ্য করেন, মনকে প্রবোধ দেন।

কিন্তু উপস্থিত কন্যাদায়ের ভাবনা, পুত্রের মুখ দেখিয়া নিবৃত্তি করিতে পারিলেন না। কেন না, এটা যে হাতাহাতি—এখনই চাই! শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, মেয়ে তেরয় পা দিতে যায়, কাজেই দত্তজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। শেষে, প্রকাশের বিবাহ দিয়া, সেই টাকাতেই মেয়ের বিয়ে দিবেন, স্থির করিলেন।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা! প্রকাশের 'দলিল' কি? কি দেখিয়া লোকে এখন তাহাকে কন্যাদান করিবে? বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'চাপরাস'খানা বাগাইতে পারিলে, তবে না প্রকাশের স্বারস্ব দাঁড়াইবে? হাঁ, তখন দত্তজের মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে বটে! শুধু মনস্কামনা পূর্ণ কেন,—তখন তিনি কিছু সংস্থানও করিয়া লইতে পারেন। কেন না, তখন যে তিনি পাস-করা-ছেলের বাপ! আর, এখন?—এখন তিনিও যা, আর পথের ধূলিমাটিও তা'।

---

(৩)

ভাল, তা-ই স্থির করিলেন। আর ছয়মাস পরে প্রকাশের বিবাহ দিয়া, তার পরে মেয়ের বিয়ে দিবেন। কিন্তু এ ছটা মাস, দত্তজের পক্ষে, যেন ছটা যুগ বোধ হইল। দিন আর কাটে না। কোন রকমে, মরার-মতন হইয়া, পুত্রের পরীক্ষার কাল গণনা করিতে লাগিলেন; এদিকে মেয়েও তের ছাড়াইয়া চোদ্দয় পা দিল। এ দৃশ্য, দত্তজ, অতি কষ্টে দেখিলেন। কেন না, আগামী সপ্তাহে প্রকাশ পরীক্ষা দিবে; তাহার এক মাস দেড় মাস পরেই, পাসের খবর বাহির হইলেই, দত্তজ দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন। 'সাত সরিষা' দিয়া গঙ্গাস্নান করিবেন। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ! টাকা নাই বলিয়া, কোন্ পিতা, অপাত্রে কন্যাদান করিতে পারেন?

প্রকাশ যে পাস হইবে, সকলেরই ইহা ধ্রুব বিশ্বাস। দত্তজ এক একবার এ সুখের কল্পনায় বিরলে আনন্দাশ্রু পাত করেন।

কেন না, প্রকাশ পাস হইলে, তাহার বিবাহের টাকায় কন্যা-দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবেন। নহিলে যে, তাঁহাকে জাতি-চ্যুত—ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়!

কিন্তু হা ভাগ্য! পরীক্ষার প্রশ্ন-চুরী-উপলক্ষে, বিশ্ববিদ্যা-লয়ে এক মহা বিভ্রাট বাধিয়া গেল। চুরী ধরা পড়িল—পরী-ক্ষার পরে। আগে ধরা পড়িলে অনেক ছেলের পরকাল আর জন্মের মত নষ্ট হয় না!

যথা সময়ে আবার পরীক্ষা গৃহীত হইল। প্রকাশও আবার পরীক্ষা দিল। কিন্তু হায়, দত্তজের কপালক্রমে, প্রকাশ এবারকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। অনেক ভাল ছেলের অদৃষ্টে, এই রকমই ঘটিল।

দত্তজের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। যে আশায় এতদিন বুক বাঁধিয়াছিলেন, সে আশালতা নির্ম্মূল হইল। এদিকে নলিনী, চোদ্দও উত্তীর্ণ হয়। মেয়ের মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না। পিশাচের দেশ হইয়াছে, দয়া-ধর্ম্ম-মায়া সকলই যাইতে বসিয়াছে,—এক-মাত্র অর্থাভাবে, দত্তজ, এ মহা দায় হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছেন না।

দিন চলা ভার। ছেলেকেও আর লেখা পড়া শিখাইতে পারিলেন না। সুতরাং দত্তজের সকল আশা-ভরসা লোপ পাইল। মেয়ের ভাবনা ভাবিয়া, তাঁহার অস্থি-চর্ম্ম-সার হইল। তিনি সত্বরই কঠিন রোগগ্রস্ত হইলেন; এবং দেখিতে দেখিতে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই, কালের কোলে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন।

বিকার-কালে চিন্তাতুর হতভাগ্য পিতার মুখ হইতে, কেবলই মেয়ের বিয়ের প্রলাপ উচ্চারিত হইয়াছিল।

---

(৪)

অল্প বয়সেই প্রকাশের মাথায়, সংসারের গুরুভার পড়িল। অতি কষ্টে, কোন প্রকারে পিতৃদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া, প্রকাশ ভগিনীর বিবাহ-দায়ে বিব্রত হইয়া পড়িল। আত্মীয়-কুটুম্ব যে যেখানে ছিল, একে একে সকলের শরণাপন্ন হইল, পায়ে ধরিল। কিন্তু এ দুঃসময়ে কেহই তাহার আঁতের ব্যথা বুঝিল না। সকলেই মুখে "আহা, আহা" করিয়া বিদায় দিল।

একে একে সকল স্থলে নিরাশ হইয়া, প্রকাশ গৃহে ফিরিল। দুঃখিনী মায়ের মুখ দেখিয়া, মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল। অভাগিনী জননীও, পুত্রের সহিত যোগ দিলেন। কাঁদিতে, কাঁদিতে, দেবতার চরণে দুঃখের কাহিনী নিবেদন করিলেন। মাতা-পুত্রের অনেকক্ষণ, এই ভাবেই অতিবাহিত হইল।

ক্রন্দনে,শুভ ফল ফলিল। দেবতার চরণে আর্ত্তের কাতরোক্তি স্থান পাইল।

বস্তুতঃ, আজ প্রায় তিন বৎসর যাবৎ শত চেষ্টায়ও যাহা হয় নাই,—এক দিনের, কয়েক মুহূর্ত্তের, সামান্য একটি ঘটনায়, তাহা হইল। হঠাৎ একজন বিদেশী লোক আসিয়া, এক সম্বন্ধ উপস্থাপিত করিল। কন্যাপক্ষের কোন খরচপত্র নাই, বরকে কিছুই দিতে হইবে না;—এমন কি, বিয়ের খরচটাও বরপক্ষ দিতে প্রস্তুত আছেন।

পরম্পরায় জানা গেল, পাত্র অতি সৎ। এমন সৎপাত্রে কন্যা দান করা শ্লাঘার কথা। মাতা পুত্রের আনন্দের আর সীমা রহিল না। মনে মনে ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ প্রদান করিল।

বরপক্ষের লোক, মেয়েকে পাকা দেখিয়া যাইতে চাহিলেন। সামান্য বেশভূষায় নলিনীকে তথায় আনা হইল। কিন্তু সেই সামান্য বেশেই স্বভাবসুন্দরীর শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। লোকটি দেখিলেন,—ক'নের চাঁদপানা মুখ,সুকুমার অঙ্গসৌষ্ঠব। প্রীতিপ্রসন্ন মনে তিনি ক'নেকে ধান-দূর্ব্বায় আশীর্ব্বাদ করিয়া, শুভদিন স্থির করিলেন।

আনন্দে মাতা-পুত্রের চক্ষে টস্‌টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। প্রকাশ, কৃতজ্ঞহৃদয়ে সেই ভদ্রলোকটির চরণে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। গদ্গদকণ্ঠে কহিল, "আপনি যিনিই হোন,—আজ আমার পিতার কাজ করিলেন। আপনার ঋণ জীবনে শুধিতে পারিব না।"

প্রকাশের মাও, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া, আবেগভরে পুত্রকে কহিলেন, "জানিস না [illegible]া, উনি ঈশ্বর-প্রেরিত। ভগবান ওঁকে পাঠিয়েছেন। আমি ওঁর বয়সে বড়,—আমি এই আশীর্ব্বাদ করি, যেন উনি ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করেন।"

ভদ্রলোকটি বিনীতভাবে কহিলেন, "মা, আমাকে সন্তান-তুল্য ভাবিবেন। আমার কাছে ওরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আবশ্যক নাই। কে, কা'র ভাল করিতে পারে, মা? যাঁর কাজ, তিনিই করিলেন, জানিবেন!"

কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল, ভদ্রলোকটি বরের একজন বিশিষ্ট আত্মীয়। বরের রূপ আছে, গুণ আছে;—তা ছাড়া বর সম্ভ্রান্ত

ঘরের ছেলেও বটে। তার উপর বি-এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কেবলই মেয়ের রূপগুণের পরিচয় পাইয়া, আর দত্তজের প্রশংসার কথা শুনিয়া, বরপক্ষ বিনা-পয়সায়, এ শুভ কাজ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ভদ্রলোকটি, একে একে এই সকল এবং আরও অনেক কথার আলোচনা করিয়া, যথাসময়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইল।

---

(৫)

আজ বিবাহ।

প্রাতে:, প্রকাশের জনৈক আত্মীয়, পাড়ার একজন নামজাদা জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের কাছে, বর ক'নের কোষ্ঠির ফলাফল জানিতে চাহিলেন। তিনি হন একটি নিষ্কামধর্ম্মী মহাত্মা! আত্মীয়দের কোন একটা হিত করা ত তাঁর চাই! তাই তিনি মনে মনে কি ভাবিয়া, নিঃস্বার্থভাবে, বিশেষ অনুরাগ সহকারে গণকঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইলেন। গণকঠাকুর অগ্রেই কোষ্ঠী গণনা করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগায়, ঠিক কিছু উত্তর কাহাকেও দেন নাই। প্রকাশ এবং তাহার মাও আর ও বিষয় জানিবার জন্য, বড় একটা উৎসুকও হইলেন না। কিন্তু নিষ্কামধর্ম্মীগণ ত আর তোমার আমার মত চুপ করিয়া থাকিবার লোক নন,—তাঁরা জগতের জন্য সদাই ব্যস্ত! তার সাক্ষী এই দেখ না, প্রকাশ তার ভগিনীর বিবাহ দিতেছে, তার যত না ভাবনা, তার মায়ের যত না চিন্তা, অনাহূত আত্মীয়টির কিন্তু তা

অপেক্ষাও অধিক ঔৎসুক্য। তাই আজ ভোর হইতে-না-হইতে, গণক ঠাকুরের বাড়ীতে 'ধন্না' দিয়া আছেন। গণকঠাকুর তাঁর মন্তব্য পাস করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; তাহাতেই 'নিষ্কামধর্ম্মীর'ও কোষ্ঠীর ফলাফল জানিবার-বাসনাটা বেশী বলবতী হইল।

একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া, গণকঠাকুর তাঁহার পাঁজি-পুথি আনিলেন। শেষে, আত্মীয় লোকটিকে মাথা-মুণ্ড বুঝাইয়া, স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন যে, মেয়েটির অদৃষ্টে "বৈধব্য-যোগ" আছে! আর পাত্রের কোষ্ঠীখানি দেখিয়া বলিলেন, "কিন্তু ছেলেটা ত দেখ্‌ছি, 'বিপত্নীক' হ'বে। অথচ বিবাহের সকলই প্রস্তুত।—আমি এর কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

নিষ্কামধর্ম্মী উত্তর করিলেন,—"হুঁ" !"

কিন্তু সেই এক 'হুঁ'তেই তাঁর ভিতরের ভাবটা বেশ বুঝা গেল। তিনি তখনই, ধীর পাদক্ষেপে, কুঞ্চিত কটাক্ষে, তথা হইতে উঠিলেন। যথায় বরপক্ষ বাসা লইয়াছেন,—(বর অনেক দূর দেশের; তায় আবার গাঙ-খালের পথ, সময়টাও ঝড়-তুফানের; সুতরাং বরপক্ষায়েরা বর ও পুরোহিত সমেত এক-দিন পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছেন)—সেইখানে ধীরে ধীরে উপনীত হইলেন। এবং সেই স্বাভাবিক বক্রদৃষ্টি আরও বক্র করিয়া, মিছরির ছুরির মত একটু হাসি অধরোষ্ঠে দেখাইয়া, বরকর্ত্তার পার্শ্বে বসিয়া আবার ফিক্ করিয়া হাসিলেন। তারপর সেই ভাবটি বিবাহ-বন্ধনের গুরুত্ব বুঝাইয়া এবং পতি-পত্নীর অনন্তকালের আধ্যাত্মিক-মিলন প্রমাণ করিয়া, দেখাইলেন যে, বিবাহটা বড় গুরুতর ব্যাপার; অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া এমন কাজে হাত

দিতে হয়।' অতঃপর, দৃষ্টান্তস্বরূপ গণকঠাকুরের কোষ্ঠীগণনার ফলাফলটি প্রকাশ করিলেন। সবটা নহে,—কেবল মেয়ের বৈধব্যযোগটার কথাই কহিলেন! বাকি কথাটা অর্থাৎ পাত্রের 'বিপত্নীকের' গণনাটা প্রকাশ করিলেন না। এমন না হইলে আর 'নিষ্কামধর্ম্ম' কি? কিন্তু চতুর চূড়ামণি তখনই কথাটা চাপা দিয়া, ফিক করিয়া আর একটু হাসিয়া কহিলেন, "কিন্তু আমি ও সব কিছু বিশ্বাস করি না। মানুষ যদি মানুষের ভাগ্যফল বলিতে পারিত, তাহা হইলে আর সংসারে এত দুঃখ থাকিত না।"

অতঃপর বিষটা আর এক দিকে উদ্গীরণ করিয়া, নিষ্কামধর্ম্মী কহিলেন, "তা বেশ ত, জামাই বাবাজী আমার ভাইজীটিকে বিয়ে করে আমার দাদার মুখ উজ্জ্বল করবেন! তা' মহাশয়রা,—গণক ঠাকুরের কথাটা একটা কথার কথা,—কথা নিয়ে যেন আর কোন কথান্তর না হয়!"

আবার সেই বক্রদৃষ্টির সহিত ঈষৎ হাসি ও লোকমণ্ডলীর প্রতি আবার একবার সেই অন্তর্ভেদী চাওনি! হরি হরি! সেই এক চাওনিতেই সমুদ্রপ্রমাণ বিষ উদ্গীরিত হইল। ধীরে, অতি ধীরে, মন্থর গতিতে, মৃদু হাসির সহিত এক একবার সেই লোক মণ্ডলীর প্রতি ফিরিয়া চাহিয়া নিষ্কামধর্ম্মী প্রস্থান করিলেন।

এদিকে দুর্ভাগ্য দত্তজের বংশে বিধাতা এক শোচনীয় ঘটনার সংঘটন করিলেন। তাহা বড়ই করুণরসাত্মক, বড়ই মর্ম্মভেদী। ক্রমেই সে সকল কথার আলোচনা করিতেছি।

---

(৬)

এই নিষ্কামধর্ম্মী জীবটির নাম—হরকুমার ঘোষ। সুবাদে দত্তজের একরকম ভাই। কোন কাজ কর্ম্ম নাই,—পৈতৃক দু'-দশ বিঘা জমি আছে;—তাহাতেই কোন রকমে মোটা ভাত-কাপড়টা চলিয়া যায়।

এই নিষ্কামধর্ম্ম, কালে আবার সকামেও পরিণত হয়। হরকুমারেরও তাহাই হইল। ইঙ্গিতে-আভাসে দত্তজের কন্যার মাথায় বাজ ফেলিয়া, নিষ্কামী মহাপুরুষ মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তার পরই আর এক ঘটনা! সেটা বিধির বিধান, কি প্রকৃতির প্রতিবিধান, ক্রমেই বুঝা যাইবে।

এ দিকে, বরপক্ষে, লোকমণ্ডলীর মধ্যে, মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। প্রথমে দুই একজনে ফুস্‌ফুস্ গুস্‌গুস—চুপি চুপি—কাণাকাণি,—তার পর তিলে তাল হইয়া সেই কথাটা গুরুপাকে দাঁড়াইল। মহা মুরুব্বিদল হইতে আরম্ভ করিয়া ছোকরা-বাবুদের দল পর্য্যন্ত মাথা নাড়া;—সকলের মুখেই ঐ একই কথা,—"উঁহু! এ বিবাহ কিছুতেই হইতে পারে না!"

স্বয়ং বর সুশীলকৃষ্ণ, কিন্তু এ আপত্তিতে একমত নহেন;—কথাটা তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। চোক-মুখের চেহারা দেখিয়া, তিনি যে ইহাতে বিরক্ত হইতেছেন, এমনও বুঝা যায়। এমন কি, শেষে তিনি সেই বিশিষ্ট আত্মীয় বন্ধুটিকে (যিনি দত্তজের কন্যাকে 'পাকা' দেখিতে গিয়াছিলেন) কহিলেন, "সুরেশ, এ কি কেলেঙ্কারী হইতেছে?"

বন্ধু সুরেশচন্দ্রও সেই সুরে কহিলেন, "আমিও তো তাই ভাবিতেছি! মল্লিক মহাশয়ের সকলই বাড়াবাড়ী।"

কিন্তু আর অধিকক্ষণ দুই বন্ধুকে মনের কথা কহিতে হইল না। এই সময়ে স্বয়ং মল্লিক মহাশয়, মুখখানা হাঁড়ীর মত করিয়া, মহা গরম হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন। সুশীল ও সুরেশকেই অধিক আক্রমণ করিয়া কহিলেন, "আজকালের ছেলে গুলো যেন কি হ'য়েছে! দু' পাতা ইংরেজী প'ড়ে ধরাখানাকে সরাখানা দেখে! এত নাস্তিকপাষণ্ডের দপ্‌দপানীতে হিঁদুয়ানী আর থাকে কি রকমে?

এই কথাটা বলিতে গিয়া, বুড়ো বিড়ির-বিড়ির করিয়া এক কথা শতবার আওড়াইল; সুশীল ও সুরেশকে দীক্ করিয়া তুলিল। সুশীল একটু বিরক্তিভাবে কহিল, "তা আপনি অমন করিতেছেন কেন? কি,—হইয়াছে কি?"

খুড়া কপালে করাঘাত করিয়া একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "হবে আর কি? আমার মাথা আর মুণ্ডু!"

সুশীল আর কোন উত্তর করিল না; মুখখানি নত করিয়া কিছু অসন্তুষ্ট ভাবে বসিয়া রহিল। সুরেশ কহিল, "তা' নাস্তিক পাষণ্ডের দপ্‌দপানীতে হিঁদুয়ানী গেল কি রকমে?"

বৃদ্ধ ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "গেল কি রকমে! জান না! দেবতা-বামন মান না; কর-কুষ্ঠী বা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস কর না; অদৃষ্ট ও ভবিতব্যকে উড়াইয়া দাও;—এগুলো কি হিঁদুয়ানী, না খ্রীষ্টানী?"

সুশীল ও সুরেশ বৃদ্ধের মনোভাব বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, বৃথা কথা-কাটাকাটিতে কোন ফল নাই। বুঝিলেন, নিষ্কাম-ধর্ম্মী মহা সর্ব্বনাশ বাধাইয়াছে।

ফলেও তাহাই হইল। বৃদ্ধ, সুশীলের খুল্লতাত। উপস্থিত

তিনিই একমাত্র অভিভাবক। সুশীল ও সুরেশের একান্ত অনুরোধে, তিনি বিনা পয়সায় এ শুভকার্য্যে সম্মত হইয়াছিলেন। তা' বলিয়া ত, জানিয়া শুনিয়া আর তিনি আপন গ্রহ আপনি ডাকিয়া আনিতে পারেন না! বিশেষ, যে-সে বিষয় নয়, যেমন তেমন কথা নয়,—মেয়েটার অদৃষ্টে আছে বৈধব্য-যোগ! অন্তরে দুর্গানাম জপ করিয়া, বৃদ্ধ এ সংকল্প ত্যাগ করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রকে কহিলেন, "বাবা সুশীল! আমার অবাধ্য হইয়া, আমার মনে ব্যথা দিও না। এমন অলক্ষণা কন্যার সহিত কিছুতেই তোমার বিবাহ হইতে দিব না। দাদা স্বর্গে গেছেন, আমি এখনও আছি। আমি থাকিতে তোমার অমঙ্গল দেখিতে পারিব না।"

বৃদ্ধের চক্ষু হইতে টস্‌টস্ করিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল। সুশীল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। বুকের ভিতর একটা আঘাত লাগিল। সুরেশ ব্যথিত, চিন্তিত ও হতাশ্বাস হইলেন। মুখ ফুটিয়া কাহারও কোন কথা বলিতে সাহস হইল না;—বৃদ্ধের মুখের উপর কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না।

---

(৭)

বরপক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মহাত্মা নিষ্কামধর্ম্মী, ওরফে হরকুমার ঘোষ মহাশয়, মহা দুঃখিতান্তরে কন্যাপক্ষে—বিবাহ বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কারণ, নিষ্কামধর্ম্ম ত দুই দিকেই পালন করা দরকার! কিন্তু তাঁর সে সময়ের সে বিমর্ষ ভাবটি দেখিলে, আমাদেরও দুঃখ হয়। দুঃখ হয় এই,

ভগবান এ সংসার এত সৌন্দর্য্যময় করিয়া, সয়তানধর্ম্মী মানুষ সৃষ্টি করিলেন কেন?

হরকুমার মহা বিমর্ষভাবে বিবাহ-বাড়ীতে দর্শন দিলেন। আনন্দের দিনে গুণধর খুল্লতাতের এরূপ বিমর্যভাব দর্শনে, প্রকাশ কিছু ব্যথিত হইল। ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, "কাকা মশাই, আপনি ওরকম বিষণ্ণ কেন?"

ভগ্নস্বরে, অতি অস্পষ্টভাবে, দীর্ঘনিশ্বাস টানিতে টানিতে, খুল্লতাত কহিলেন, "আর বাবা!"

এক "আর বাবা" বলিয়াই খুল্লতাত বসিয়া পড়িলেন। কপালে করাঘাত করিয়া পুনরায় কহিলেন, "আর বাবা! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! দাদার মত এমন পোড়া-কপাল কোথাও দেখিনে!"

আবার সেই ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, যাতনা-জড়িত অস্পষ্ট কথা, ও মধ্যে মধ্যে নানা ভঙ্গিমায় শিরে করাঘাত! প্রকাশ ভালর লক্ষণ বুঝিল না। ব্যাকুলভাবে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "কি কাকা মশায়! কি, হয়েছে কি? কি,—শীঘ্র বলুন!"

"আর বাবা!"

গুণধর খুল্লতাত পুনরায় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সেইভাবে আবার কহিলেন, "আর বাবা, তোকে আর বল্‌বো কি, বউকে ডাক্, সব বল্‌ছি!" প্রকাশ আরও ব্যাকুলভাবে, আরও হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিকলকণ্ঠে ডাকিল, "মা, মা!"

গলার আওয়াজ শুনিয়া, আওয়াজের সহিত ভয়-বিস্ময়-ব্যাকুলতার সমাবেশ দেখিয়া, মাও ত্বরিতপদে, বুক চাপিয়া ধরিয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে, কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন, "কি বাবা?—কেন বাবা!

অতঃপর হরকুমারকে দেখিয়া কহিলেন, "একি ঠাকুর পো যে! কি হয়েছে, ঠাকুর পো?"

"আর বউ!"

আবার সেই বিকট দীর্ঘনিশ্বাস! ভ্রাতৃজায়া তাহাতে ভীত হইলেন। কহিলেন, "কি হ'য়েছে খুলে বল! দোহাই ঠাকুরপো!"

পুত্রকে কহিলেন, "বাবা, তুইও চুপ ক'রে রয়েছিস কেন? আমার মাথা খাস্, বল্!"

প্রকাশ মায়ের কথায় কোন উত্তর না দিয়া, নীরবে দুই ফোঁটা চক্ষের জল মুছিল।

হরকুমার আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অতি সংক্ষেপে কহিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে! কে গিয়ে বর-কর্ত্তার কাণে তুলেছে যে, মেয়ের অদৃষ্টে বৈধব্য-যোগ আছে! বরকর্ত্তা তাই না শুনে মহা গণ্ডগোল বাঁধিয়ে তুলেছে। সবাই বেঁকে বসেছে,—এখানে ছেলের বিয়ে দেবে না!"

"এ্যাঁ!" বলিয়া প্রকাশের মা বসিয়া পড়িলেন। "সে কি কাকা মশাই!" বলিয়া, প্রকাশও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। কাকা মহাশয় উপদেশ দিলেন,—"আর বাবা, ভেবে আর কি করবে বল? ভবিতব্য কে খণ্ডন করবে? তাঁদের কি বল,—তাঁদের ছেলে, তাঁদের তো আর জাত যা'বার ভয় নেই, কিন্তু তোমার-আমার সে ভয় বিলক্ষণ আছে! বিশেষ মেয়ের গায়ে হলুদ দেওয়া হ'য়েছে। গায়ে হলুদ দিয়ে, হিঁদুর ঘরের মেয়েকে তো আর দুদিন রাখ্বার যো নেই! তাই তো, এখন উপায় কি?"

কথা শুনিয়া, প্রকাশের মা, মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "তবে কি হ'বে ঠাকুর পো?

আমার যে জাত যায়! প্রকাশ, তুই যা' বাবা! তাঁদের পায়ে হাতে ধ'রে বুঝিয়ে বল্ গিয়ে; দুঃখীকে দয়া করলে, ভগবান তাঁদের ভাল কর্‌বেন। ওরে, আমার এমন সাধে কে বাদ সাধ্‌লে রে!"

অভাগিনী, মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রকাশও তাহাতে যোগ দিল। নিষ্কামধর্ম্মী, আর তথায় অপেক্ষা করা নিরর্থক বুঝিয়া, প্রস্থান করিতে করিতে কহিলেন, "প্রকাশ, কেঁদ' না! ছিঃ বাবা, তুমি তো আর অবুঝ নও! বরেদের কাছেও যাওয়া মিছে! আমি তো আর বুঝ্‌তে বাকী রাখি নেই! তুমি বরং অন্য চেষ্টা দেখ। আজকের লগ্নের মধ্যেই তোমাকে যে কোন ব্যক্তিকে ভগিনীসম্প্রদান করতে হ'বে! নইলে তোমাদের ধর্ম্মচ্যুত, সমাজচ্যুত হ'তে হ'বে। তুমি ত বাবা অবুঝ নও।—এখন কান্না রেখে, বরের চেষ্টা দেখ। আমি এখন আসি।"

সয়তান, "সাধে বাদ" সাধিয়া প্রস্থান করিল।

কুমারী নলিনী, এই সময় সমবয়স্কা সঙ্গিনীদের সহিত, আমোদ-আহ্লাদ করিতেছিল। হঠাং তাহার স্মরণ হইল, "কাজলনতা" খানি ত তাহার কাছে নাই! হঠাৎ বালিকার বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তখনই এখান-ওখান সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিল; সঙ্গিনীগণও সকল স্থান পাতি পাতি করিয়া খুঁজিল;—কিন্তু হায়! কোথাও সে মাঙ্গলিক স্মৃতির সন্ধান পাইল না!

---

(৮)

নলিনী, মুখখানি চুন-মত করিয়া মার কাছে গেল। দেখিল, শতধারে মার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই নলিনীর চক্ষু হইতেও, তাহার অজ্ঞাতসারে, টস্-টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া, মা, আরও কাঁদিয়া উঠিলেন।

কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল। কান্নার বেগ একটু প্রশমিত হইলে, নলিনী কাঁদ কাঁদ মুখে কহিল, "কাঁদিতেছ কেন, মা?"

এ প্রশ্নে মা, আরও কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "মা নলু! এমন পোড়া কপালীর পেটেও এসেছিলি! তোর ভাবনা ভেবে ভেবে, তিনি অকালে চলে গেলেন! সাধুপুরুষ তিনি, তাঁর স্বর্গবাস হয়েছে;—আমি পোড়া-কপালী, আমাকে এই সব দেখ্‌বার জন্যে, এখানে থাক্‌তে হয়েছে। মা রে! তোর অদৃষ্টেও শেষে এত ছিল?"

সংক্ষেপে, মা, একে একে সকল কথা কন্যাকে বলিলেন। নলিনী বুঝিল, তাহার জন্যই এত অনর্থ! বালিকা মনে মনে কহিল, "হায়, আমি জননী-জঠরে মরিলাম না কেন? আমার জন্য বাবা গেলেন, মার আমার অস্থিচর্ম্ম সার হয়েছে, দাদার আমার আহার-নিদ্রা উঠেছে! বুঝ্‌লেম, আমিই যত অনর্থের মূল! হায়, বাবা বেঁচে থেকে, আমি মলেম না কেন?"

বালিকা মুখখানি নত করিয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিল; আর মুখ বাহিয়া টস্-টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

প্রতিবেশী, আত্মীয়বর্গও এই সময়ে তথায় সমবেত হইল। এই দারুণ দুঃসংবাদে, সকলেই "হায় হায়" করিতে লাগিল।

---

(৯)

এদিকে হরকুমার, স্বকার্য্য সাধন করিয়া, পুনরায় বর-কর্ত্তাদের বাসা-বাটীতে আবির্ভূত হইল। কি-একটা মতলব আঁটিয়া, কুঞ্চিতকটাক্ষে,—স্বাভাবিক বক্র-দৃষ্টি আরও বক্র করিয়া, তাহার সহিত একটু 'কিক' করিয়া হাসিয়া, বরকর্ত্তার সম্মুখে উপবেশন করিল। একটু ইতস্ততঃের পর, মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে কহিল, "আর মল্লিক মশাই! ভাব্‌চেন কি? ভবিতব্য কে খণ্ডন করবে, বলুন? আপনি মহাশয়-লোক,—এখন যা হয় একটা অন্য উপায় করুন। এত দূর থেকে বিবাহ দিতে এসে তো আর ফিরে যাওয়া সঙ্গত হয় না! খরচ-পত্রও দেখ্‌চি যথেষ্ট হ'য়েছে। তাই তো—"

হরকুমার বড়ই সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল,—"তাই তো,—বিধাতার কেমন বিড়ম্বনা দেখ?"

ইত্যাকার আরও অনেক বোল-চাল দিতে লাগিল। পরে যখন বুঝিল, 'মতলব হাসিল' হইয়াছে, তখন উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল, "তবে মল্লিক মশাই, বস্‌তে আজ্ঞা হয়।"

মল্লিক মহাশয় হরকুমারের হাত ধরিয়া কহিলেন, "যান কোথায় ম'শাই! আমাদের একটা 'কিনারা' ক'রে দিন! আপনারা এতগুলি ভদ্রলোক থাক্‌তে—এ ভদ্রসমাজে এসে কি, নিরাশ্বাস হ'য়ে যাব?"

"হাঁ, তা বটে! কিন্তু—"

'কিন্তু' বলিয়া, হরকুমার 'ঢোক' গিলিল। ঢোক গিলিয়া, মুখ চিবাইতে চিবাইতে কহিল,—"কি জানেন ম'শাই, আমার আর্থিক অবস্থা বড় ভাল নয়। লোকের সব সময় সমান যায় না। তবে মেয়েটি-আমার বড় লক্ষ্মী, পয়মন্ত। সাত নয়, পাঁচ নয়,—ঐ আমার আঁধার ঘরের মাণিক! মা-আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী!"

মল্লিক মহাশয়, একাগ্রচিত্তে, কাণ খাড়া করিয়া, হরকুমারের কথাগুলা গিলিতে ছিলেন। যাই কথা থামিল, অমনি বুড়া "হাঁ হাঁ" করিয়া, বিশেষ ব্যস্ততাসহকারে, আহ্লাদে, সভাসদবৃন্দকে—অর্থাৎ বর, বরযাত্রী, আত্মীয় কুটম্ব সকলকে—কহিলেন, "ভাবনা কি—ভাবনা কি? যাঁর ভাবনা, তিনিই ভেবে রেখেছেন! তাই তো বলি, মা জগদম্বা কি মুখ তুলে চাবেন না?"

তারপর বৃদ্ধ, সুরেশের সহিত সুশীলকে ডাকিয়া কহিলেন, "আর বাবাজী, ভাবনা কি! এই দেখ, বুড়োদের এক আবটা কথা মেনো! কোথাকার একটা অলক্ষুণে মেয়ে খামকা ঘরে নিয়ে যা'ব? কেন, মেয়ের ভাবনা কি? এই ঘোষজা মহাশয়ের পরম রূপবতী একটি কন্যা আছে; এখনই—আজিকার লগ্নেই শুভ-কার্য্য সমাধা হ'বে! এই দেখ বাবাজীরা, কোন বিষয়ে অত উতলা হ'ও না! উতলা হওয়া বড় দোষ।"

অতঃপর, হরকুমারের সহিত, মল্লিক মহাশয়ের সকল কথা শেষ হইল। হরকুমারের এক পয়সা খরচ-পত্র নাই, মেয়ের গহনা-গাঁটি—এমন কি, বিবাহের যাবতীয় খরচ-পত্রও, পাত্রপক্ষ হইতে সম্পন্ন হইবে।

তখনই মেয়ে দেখিতে যাওয়ার কথা হইল। ভার পড়িল,—সুরেশচন্দ্রের উপর। সুরেশ একটু ইতস্ততঃ করিল। কহিল, "আমি আর নাই দেখ্‌তে গেলুম। মল্লিক মশাই নিজে যান না।"

মল্লিক। ওহে, আমি বল্‌ছি,—তুমি যাও না!

---

(১০)

এই সময় প্রকাশ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহার সেই আকুলি-ব্যাকুলি ভাব, চক্ষের সেই হতাশ-দৃষ্টি, মুখের সেই বিষাদ-কালিমা দেখিয়া, সুশীল ও সুরেশের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অথচ, তাঁহারা মুখ ফুটিয়া, একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। হরকুমার, প্রকাশকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া একটু অধিক ব্যগ্রতাসহকারে কহিল, "তবে মল্লিক ম'শাই, কে মেয়ে দেখ্‌তে যা'বেন, আসুন। আর সময় নেই।"

"হাঁ, ম'শায়ের সঙ্গেই লোক পাঠাচ্ছি। ওহে সুরেশ, যাও না! প্রসন্ন, তুমিও না! হয় ওঁর সঙ্গে যাও না! আঃ! তোমাদের নিয়ে তো দেখ্‌ছি, কোন কাজ-কর্ম্ম চলে না!"

প্রসন্ন নামক জনৈক প্রতিবেশী বরযাত্রী বিনীতভাবে কহিল, "আজ্ঞে, যাচ্ছি। ওহে সুরেশ ভায়া, চল যাই।"

সুশীলকৃষ্ণ জনান্তিকে সুরেশকে কহিলেন, "যাও ভাই, আমার শ্রাদ্ধের আয়োজন করগে!"

সুরেশ, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, সেইরূপ মৃদুস্বরে কহিলেন, "আর ভাই, এদিকে দেখেছ ?'

"কি ?"

সুরেশ, প্রকাশকে দেখাইয়া কহিল, "এই সেই হতভাগ্য ভাই! বেচারা,ভগিনীর বিবাহের দায়ে, কিরূপ বিবর্ণ হইয়াছে, দেখ! বুঝি,এতক্ষণে, এ দুঃসংবাদ উহাদের কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। ভাই, আমার মুখ দেখাইতে লজ্জা করিতেছে!"

সুশীল কহিলেন, "সুরেশ, আমিও কি মনে কর, আনাতে আছি? কি কর্‌ব? উনি খুল্লতাত;—মনে কর্‌বেন, বাবা নেই ব'লে আমি ওঁর অবাধ্য হ'য়েছি। ভাই, বুঝ্‌লেম, বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নি।" তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "যাও, ওঁর কথাই রাখ। আর ভাবিলে কি হ'বে?"

সুরেশ কহিলেন, "সুশীল, যেতে যে পা সরে না, ভাই!"

এই সময় খুড়ো মহাশয় একটু রাগতভাবে কহিয়া উঠি-লেন,—"সুরেশ, আমার কথাটা কি তোমাদের মনঃপূত হ'ল না? তা' হ'বে কেন? দাদা তো নেই,—সুশীলের যা ইচ্ছা হয়, করুক! কিন্তু আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত—"

বলিতে বলিতে, বৃদ্ধের গণ্ডস্থল বহিয়া, দুই-ফোঁটা গরম জল পড়িল। ইহা দেখিয়া, সুশীল, ব্যাকুলভাবে সুরেশকে কহিল, "যাও ভাই, উঁহার কথাই রাখ। কাটা-ঘায়ে আর নুনের ছিটা সহিতে পারি না!"

বিনা-বাক্যব্যয়ে, প্রসন্নকে সঙ্গে লইয়া, সুরেশ মেয়ে দেখিতে চলিল। অগ্রে হরকুমার, পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রসন্ন ও সুরেশ।

এতক্ষণে প্রকাশ, সকল রহস্য বুঝিল। বুঝিল যে, তাহার গুণের খুড়ো, তাহাদের মাথায় বাজ ফেলিয়াছে! প্রকাশের

বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কম্পিত-কণ্ঠে, কাঁদ কাঁদ মুখে কহিল, "হর কাকা, হর কাকা—"

মুখ ফুটিয়া সকল কথা বাহির হইল না। বালক মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "হর কাকা, তুমি না আমাদের পরমাত্মীয়? তোমার কাছে না মা-আমার জাতরক্ষার উপায় জিজ্ঞাসা ক'রে ছিলেন? হা ধর্ম্ম! কোথায় তুমি? হর কাকা, বড় সাধে বাদ সাধিলে!"

হরকাকা, সে কথার আর কোন উত্তর না দিয়া, মনে মনে প্রকাশের মুণ্ডপাত করিতে করিতে প্রস্থান করিল। সুরেশ, একবার মাত্র পশ্চাৎ ফিরিয়া, প্রকাশকে দেখিয়া, দুই ফোঁটা চক্ষের জল মুছিলেন। সুশীল অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।

বৃদ্ধ মল্লিক মহাশয়, এতক্ষণে যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। এমন সময় প্রকাশ আসিয়া, তাঁহার পা দু' খানি জড়াইয়া ধরিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আবেগভরে কহিল, "মহাশয়, হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা করুন! কায়স্থের জাতি রক্ষা করুন! আমার ভগিনীর ধর্ম্ম রক্ষা করুন! আপনি আমার পিতার কাজ করুন! দোহাই আপনার!"

মল্লিক মহাশয়, মুরুব্বিয়ানা চালে কহিলেন, "ওহে বাপু, তুমি ছেলে-মানুষ; সংসারের কিছুই বুঝ না;—তাই এমন কথা বলছ! কি জান,—এ যে-সে কাজ নয়—বিবাহ! এ বড় গুরুতর কাজ! এতে বাপু, অনুরোধ-উপরোধ চলে না। কি জান, এ হ'চ্ছে চিরকালের সম্বন্ধ! বিশেষ, জেনে শুনে, কে বল, কাল-কূট সেবন করে? তোমার ভগিনীর কোষ্ঠীতে যখন বৈধব্য-যোগ আছে, তখন কিছুতেই আমি এ সম্বন্ধে রাজি হ'তে পারি না। তোমরা অন্য চেষ্টা দেখ গে বাপু!"

প্রকাশ আরও কাঁদিল, আরও স্তব-বিনয় করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বুড়া, ঐ একই কথা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে। তখন প্রকাশ, নিরুপায় হইয়া, ভগ্ন-মনে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

যথা সময়ে হরকুমার, [illegible] মনের-মত সাজাইয়া, বর-পক্ষকে দেখাইল। [illegible]—নির্ম্মলা। সুরেশ ও প্রসন্ন দেখিল, নির্ম্মলা ত [illegible]।—কাঁচা সোণার মত রং, চাঁদপানা মুখ, সুন্দর [illegible]। বস্তুতঃ, দত্তজের কন্যা অপেক্ষাও হরকুমারের মেয়েটি সুশ্রী, সুরূপা, সুলক্ষণা। তখনই ধান্যদূর্ব্বাদানে আশীর্ব্বাদ করিয়া, পাত্রপক্ষ, বাসায় প্রত্যাগত হইলেন। হরকুমার, তখনই কন্যার গাত্র-হরিদ্রা-কার্য্য সম্পন্ন করিল, বিবাহের সমস্ত আয়োজনে ব্যাপৃত হইল। এদিকে প্রকাশ ও তাহার মা, সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়া, অগত্যা এক অশীতিবর্ষ রুগ্ন বৃদ্ধের হস্তে নলিনীকে অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইল।

সন্ধ্যা হইল। দত্তজের বাড়ীতে বিবাহ-বাসর সজ্জিত হইল; এদিকে হরকুমারের বাটীতেও বিবাহের আয়োজন হইল। যথা সময়ে, দুই স্থলে দুই পাত্রের সমাবেশ হইল। যথা সময়ে, নিরুদ্বেগে, দুই শুভ উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু দুঃখের মধ্যে, সম্প্রদানের সময়, নলিনীর দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দিত হইল ও চক্ষে জল দেখা দিল। আর অন্য সম্প্রদান-সভায়, নির্ম্মলাকে

করিবার সময়, হরকুমারের হাত কাঁপিয়া উঠিল; ও মন্ত্র-
ণ করিবার সময়, সে ঠিক বিপরীত কথা বলিয়া ফেলিল!
ন, সে সময়, অন্তরে, ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন।
অদৃষ্ট, কাল ও কর্ম্মফলের অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়া গেল!

---

(১২)

ভবিতব্য কে খণ্ডন করিবে? 'গণনা'র ফলাফল হাতে হাতে
। বিবাহের এক সপ্তাহ পরেই, ক্ষুদ্র নলিনী পুষ্পটি শুকাই-
ল—বালিকা, জন্মের-মত বৈধব্য-মুকুটে মস্তক শোভিত
প্রকাশ ও তাহার মার বুকের এক এক খানি হাড়

দিকে?—এদিকে, সুশীলের বিবাহের একমাস পরেই,
সেই সংসারের একমাত্র বন্ধন, বিপদ-সমুদ্রে ধ্রুব-
নসন্মত তনয়া,—সেই স্বর্ণপ্রতিমা নির্ম্মলা অকালে
পতিত হইল। সুশীলকৃষ্ণ বিপত্নীক হইলেন; হর
কন্যাশোকে পাগল হইল। শেষ, সত্য সত্যই শৃগাল-
রের সহিত হরকুমারের জঠরানলের নিবৃত্তি হইতে লাগিল।
হতভাগ্য উন্মত্তবেশে, একদিন দত্তজের বাড়ীতে উপস্থিত
নলিনাকে দেখিয়া কহিল, "মা, সতী লক্ষ্মী! তোমার
াং আমার হাতে হাতে ফলিয়াছে! মা, ব'লে দাও,
কোথায়? তুই কি মা আমার সেই প্রাণের

তনয়াভ্রমে, নলিনাকে ক্রোড়ে লইতে চেষ্টা

করিল। এইরূপ গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভ্রমি
ভাগ্যের দিনপাত হইতে লাগিল। যাহার
হতভাগ্য তাহাকেই তনয়া-ভ্রমে আদর করে
সজ্ঞান অবস্থায়, "মারে, কোথায় গেলি রে"
চীৎকার করিতে থাকে!

আর সুশীলকৃষ্ণ? সুশীলকৃষ্ণেরও জীয়
অল্প বয়সে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা, আশা, উদ্য
নিরাশা-সলিলে নিমগ্ন হইল। তিনি চিরদিনই
কিছুতেই পুনর্ব্বিবাহ করিলেন না।

এই ঘটনার ঠিক এক বৎসর পরে,
কার্য্যোপলক্ষে একবার হরকুমারের বাটীতে
তিনি বাটীর বাহিরে পাদচারণ করিতেছি
নলিনী, বর্ষীয়সী প্রাতিবেশিনীদের সহিত, গ্রা
ছিল। হঠাৎ উভয়ের চারি-চক্ষের মিলন হই
তাহাকে কখন দেখে নাই,—কিন্তু কি-জানি
য়েরই বুকের ভিতরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল
কহিলেন, "ভগবান! কি পাপে আমি
বঞ্চিত হইলাম?"

নলিনার মনেও হঠাৎ উদয় হইল
না, না,—নারায়ণ! অদৃষ্টে বল নাই!